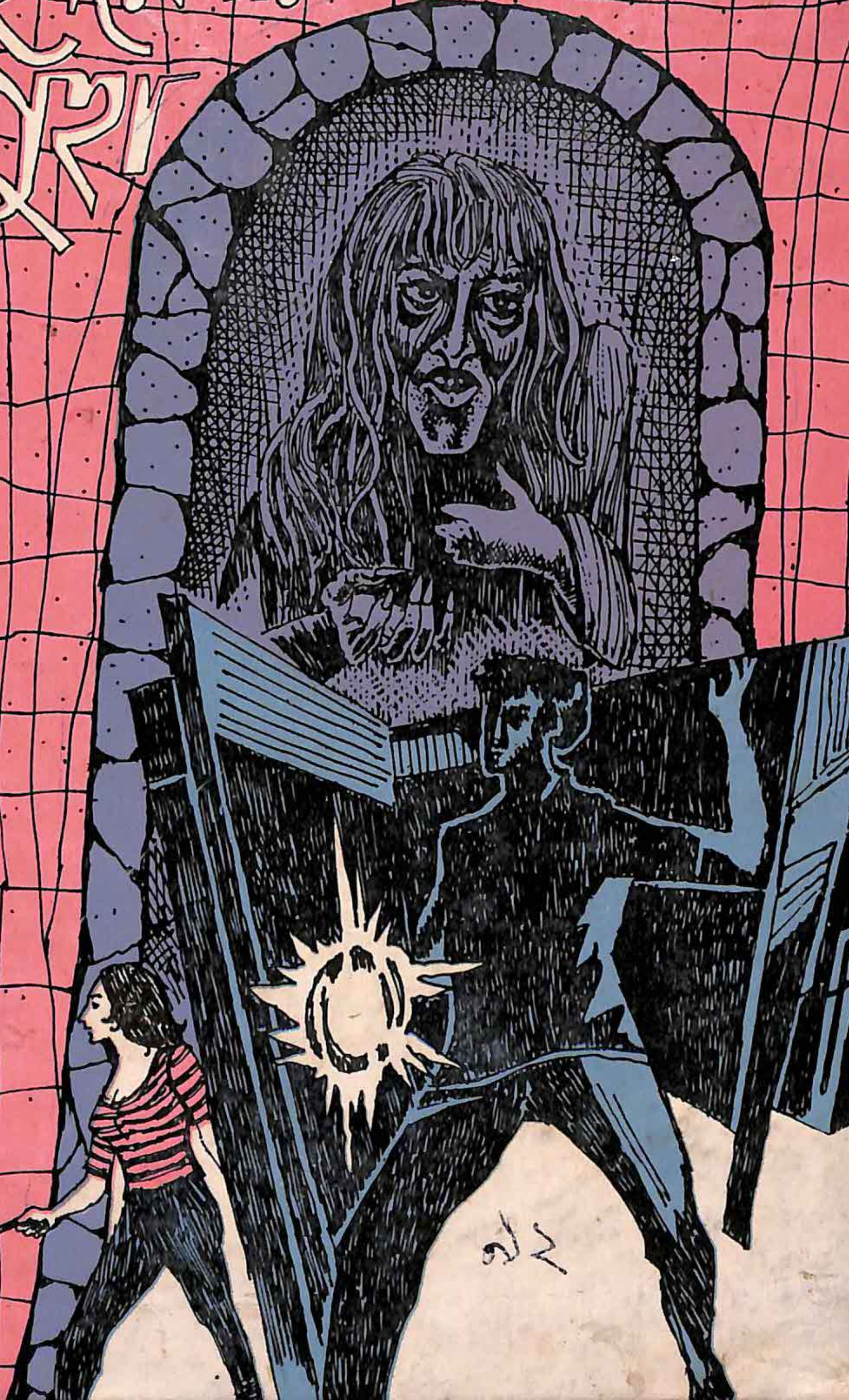
হায়েনার গুহা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ



হায়েনার গুহা

৩২

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মুখার্জী ব্রাদার্স। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৯৩

প্রকাশক
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
মুখার্জী ব্রাদার্স
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলকাতা-৪

দাম: আট টাকা

রাধাশ্যাম নন্দীকে

সস্নেহে—

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

মহেনজোদাড়োর ঘোড়াভূত
অলৌকিক চাকতি রহস্য

খুদে মানুষ মিনিহুন

গায়ে পড়ে আলাপ করতে আমেরিকানদের জুড়ি নেই। লস এঞ্জেলিস থেকে প্লেনে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনলুলু যাবার সময় এই মারকিন খুড়ো-ভাইপোর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। খুড়োর নাম জন নর্থব্রুক। ভাইপোর নাম রবার্ট ওরফে বব। খুড়োর বয়স ষাটের কাছাকাছি। গায়ে গতরে সাদা হাতি বলা যায়। ভাইপোটি তার উল্টো। কতকটা আমার মতো রোগাটে। মাথাতেও প্রায় সমান-সমান। কথায়-কথায় ফিকফিক করে হাসে। ভারি আমুদে ছোকরা।

ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের মাঝারি গড়নের প্লেন। জনা ষাটেক যাত্রী ধরে। মাঝবরাবর করিডোরের মতো যাতায়াতের পথ আছে এবং প্রতিসারে একদিকে তিনটে, অন্যদিকে দুটো করে আসন। তিনটে আসনের দিকে জানলার ধারে আসনটা আমার। বাকি দুটোয় সেই খুড়ো-ভাইপো।

খুড়ো জন আমার গায়ে। তিনিই গায়ে পড়ে জিগ্যেস করে-ছিলেন, মাফ করবেন। মশাই কি দক্ষিণদেশীয়? স্প্যানিশ, পরতুগিজ?

আমেরিকানরা যখন 'দক্ষিণদেশীয়' বলে তখন বুঝতে হবে ওরা দক্ষিণ আমেরিকার কথা বলছে। এই ক'মাসে টের পেয়েছি, কী জানি কেন সবখানেই ওরা আমাকে স্প্যানিশ বা পরতুগিজ ভাবে। ডেনভারে একজন আমাকে ইন্দোনেশিয়ার লোক ভেবেছিল। আসলে দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশে স্প্যানিশ বা পরতুগিজদের গায়ের রঙ মোটেও ফরসা নয়, রোদপোড়া তামাটে। বংশানুক্রমে ওদের পিতৃ-পুরুষদের ইউরোপীয় সাদা চামড়া নষ্ট হয়ে গেছে দক্ষিণ আমেরিকার জলহাওয়ায় এবং কড়া রোদ্দুরে। তাছাড়া সেখানে ভীষণ দারিদ্র্য।

অপুষ্টিতে তাগড়াই গতর আমার মতো প্যাকাটি হয়ে গেছে অনেকের।

জনখুড়োর প্রশ্নের জবাবে যখন নিজের পরিচয় দিলাম, তখন উনি ভারি অপ্রস্তুত হলেন। বললেন, আমার এ ভুলের জন্যে দুঃখিত মিস্টার। তাহলে আপনি ক্যালকুট্টার লোক? আমার এক দাদা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্যালকুট্টাতে ছিলেন। ওঃ! সে কত অদ্ভুত সব গল্প শুনেছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ভাব হয়ে গেল। বিদেশ-বিভুঁয়ে—বিশেষ করে পথে যেতে যেতে কারুর সঙ্গে আলাপ হলে ভালই লাগে। পথের ক্লান্তি টের পাওয়া যায় না। জন নর্থব্রুক নিজের পরিচয় দিলেন। উনি লসএঞ্জেলিসে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। এমন পণ্ডিত লোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়া খুব আনন্দের। ওঁর ভাইপো বব আমার মতোই পেশায় সাংবাদিক। এখন নভেম্বরের শেষাশেষি আমেরিকায় থ্যাংকস-গিভিং ডে'র উৎসব। তাই দিনতিনেক ছুটি। খুড়ো-ভাইপো ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে।

জনখুড়ো বললেন, আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা হনলুলুতে নামছি। তা আপনি কি হনলুলুতেই থাকছেন?

বললাম, আমার ইচ্ছে, বিখ্যাত সমুদ্রতট ওয়াইকিকিতেই কোথাও থাকব।

জন হাসলেন। ওয়াইকিকি খুব সুন্দর জায়গা। সবাই ওখানেই যায়। কিন্তু আমি বলি কি, যদি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সত্যিকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান, তাহলে চলুন আমাদের সঙ্গে কাউয়াই দ্বীপে।

বব গম্ভীর মুখে বলল, আমরা সেখানে 'মিনিহুন' দেখতে যাচ্ছি।

বললাম, মিনিহুন? সে আবার কী?

জন হাসতে হাসতে বললেন, বব সব সময় তামাশা করে। মিনি-হুন নিছক কল্পনা। আপনি নিশ্চয় বিখ্যাত বই গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়েছেন? তাতে লিলিপুট নামে খুদে মানুষদের কথা আছে। এই 'মিনি হুন' হল সেই রকম লিলিপুট মানুষ। আশ্চর্য, ক্যাপ্টেন টমাস কুক ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কাউয়াই দ্বীপে এসেছিলেন—তিনিও স্বচক্ষে ওদের দেখেছেন বলে লিখে গেছেন। তারপর দু'শোবছর ধরে এই গুজব সমানে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা মিনিহুন কেউ ধরে ফেলা তো দূরের কথা, ফটো পর্যন্ত তুলে দেখাতে পারে নি। কাজেই এটা নিছক গুলতাপ্পি। আসলে কথাটা এসেছে সম্ভবত মিনি থেকে। মিনি মানে খুদে। আর হুন হল সেই বর্বর ইউরোপীয় জাতের লোকের—যাদের নেতা ছিল অ্যাটিলা। হুনদের শরীর ছিল পেশী-বহুল। গায়ে প্রচণ্ড জোর। আমাদের সেরা পালোয়ানকেও একজন মিনিহুন নাকি তুলে আছাড় মারতে পারে।

বব তেমনি গম্ভীর মুখে বলল, আমি কিন্তু এবার যাচ্ছি মিনি-হুনদের ছবি তুলব এবং আমার খবরের কাগজে তাদের কথা লিখব। চাউড্রি (চৌধুরী), তুমিও কাগজের লোক। আমার সঙ্গী হও।

জন রাগ করে বললেন, আবার তুমি একটা বিপদ না বাধিয়ে ছাড়বে না বাপু! সেবারকার মতো আর তোমাকে আমি খুঁজতে বেরুব না বলে দিচ্ছি। হায়েনার গুহায় মরে পড়ে থাকবে।

অবাক হয়ে বললাম, হায়নার গুহা মানে?

জন বললেন, কাউয়াই দ্বীপের উত্তর উপকূলে একটা এলাকার নাম হায়না। ওখানে সমুদ্রের খাড়ির মাথায় অসংখ্য গুহা আছে। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি মিঃ জয়ন্ত চৌধুরী, কক্ষনো ববের কথায় ভুলে ওর পাল্লায় পড়বেন না।

বব আমার দিকে চোখ টিপল। ঠোঁটের কোনায় হাসি। বললাম, আচ্ছা অধ্যাপকমশাই, মিনিহুন যদি সত্যি না থাকে,

এমন গুজব রটল কেন ? আমাদের বাংলার প্রবাদ হল যা রটে, তা কিছু-কিছু সত্যি বটে।

জন বললেন, আমার ধারণা, আফ্রিকার পিগমিদের মতো বেঁটে একজাতের আদিম অধিবাসী ছিল হাওয়াই এলাকায়। কয়েকশো বছর আগে তারা লুপ্ত হয়ে গেছে। গল্পটা তাই রটে আসছে। যদি আমাদের সঙ্গে যান কাউয়াই দ্বীপে, গিয়েই শুনবেন মিনিহুন নিয়ে লোকেরা গল্প করছে। এমন কী, গাইডগুলো পর্যন্ত হলফ করে আপনাকে 'মিনি হুন' দেখাতে নিয়ে যাবে। দেখবেন তো নবডংকাটি, খামোকা একগাদা পয়সা গচ্চা যাবে। গাইড আপনাকে সমুদ্রের খাড়ির মাথায় বসিয়ে রেখে বলবে, আপনি ওইখানটায় লক্ষ্য রাখুন—খুদে মানুষ দেখতে পাবেন। সময়মতো আপনাকে এসে নিয়ে যাব। আপনি তো বসে রইলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ব্যাটা কতক্ষণ পরে এসে বলবে, কী, দেখতে পান নি ? তাহলে আজ ওরা বেরোয়নি গুহা থেকে। আপনার বরাত ! কালকে চেষ্টা করবেন। অনেকসময় হাজার ফুট নিচে পাথরের ওপর পেঙ্গুইন, একরকম সমুদ্রশকুন দেখিয়ে গাইড বলবে, ওই দেখুন ! ওই দেখুন ! আপনি যদি বলেন, ওগুলো তো পাখি—তখন গাইডব্যাটা একগাল হেসে বলবে, মশায়ের চোখ খারাপ। পাখি হলে উড়ত না ?

বব মিটিমিটি হেসে বলল, কী জায়েন্টো চাউড্রি ? যাচ্ছ তো আমাদের সঙ্গে।

বললাম, হায়েনার গুহায় তোমার সঙ্গে ঢুকতে বেজায় লোভ হচ্ছে বব। কিন্তু আমার নামটা তুমি ভুল উচ্চারণ করছ। আমি জয়ন্ত চৌধুরী।

বব বিড়বিড় করে নামটা আওড়াতে থাকল। জানলায় দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের নীল ঢেউ। আমাদের প্লেন সবুজ দ্বীপের ওপর চক্কর দিচ্ছে। হনলুলু এয়ারপোর্ট এসে গেল দেখতে দেখতে।

খুড়ো ভাইপোর সঙ্গে আধঘণ্টা পরে ফের প্লেনে উঠলাম। কাউয়াই দ্বীপে পৌছতে মোটে সাতাশ মিনিট লাগল। এই এয়ার-পোর্টের নাম লিহিউ। চারদিকে আখের ক্ষেত, মধ্যিখানে বিমান-ক্ষেত্র। গেট পেরিয়ে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম তিনজনে। জনখুড়ো ট্যাকসি চালককে বললেন, হায়েনা টাউনশিপ।

কাউয়াইকে বলা হয় উদ্যানদ্বীপ। সবুজ গাছে ভরা। দূরে হাজার পাঁচেক উঁচু পাহাড় 'মাউন্ট ওয়াইয়ালেয়ালে।' আসলে দ্বীপটার চারদিকেই উঁচু পাহাড়। খাড়িগুলো বিপজ্জনক। কাউয়াই-দ্বীপে তাই জাহাজ ভেড়ার জায়গা নেই। কয়েক মাইল দূরে জাহাজ রেখে ছোট ছোট বোটে দুঃসাহসীরা খাড়িতে যদি বা ঢুকতে পারে, তীরে ওঠা অসম্ভব। খাড়া পাহাড়। তাই এ দ্বীপের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ শুধু প্লেনে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে টমাস কুক এ দ্বীপে নামতেই পারেন নি।

ছোটবড় গোটা আষ্টেক দ্বীপ নিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। আমেরিকার শাসনে রয়েছে। তাই আমেরিকায় ঘুরে যেমনটি দেখেছি, এখানেও তাই। সুন্দর সুন্দর চকচকে রাস্তাঘাটে পায়ে হাঁটা লোক নেই। এই কাউয়াই দ্বীপকে সত্যি একটা বাগানের মতো সাজিয়ে রেখেছে। হায়েনা উপনগরী পাহাড়ী টিলার গায়ে। উত্তর-পশ্চিম জুড়ে প্রশান্ত মহাসাগর। প্রায় হাজার ফুট নিচে সমুদ্রের জল গর্জন করছে। সাদা ফেনা তুলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রপাখি উড়ছে। শব্দে কান পাতা দায়।

ততক্ষণে লিহিউতে নেমেই জনখুড়ো ফোন করে হোটেল বুক করেছেন। হোটেলের নাম কোকো পাম হোটেল। দোতলা হোটেল। ওপরতলায় আমি একটা সিঙ্গল স্যুট, খুড়োভাইপো একটা ডাবল-

স্যুট ভাড়া করেছেন। এ হোটেলেও যা রাজকীয় বিলাস আর আরামের ব্যবস্থা, আমাদের দেশের সেরা হোটেলেও তা কল্পনা করা যায় না। জানলা দিয়ে খাড়ির নিচে সমুদ্র চোখে পড়ছিল। বিকেল চারটে বেজে গেছে। পাশের ঘর থেকে ফোন করলেন জনখুড়ো। কফি খেতে ডাকলেন।

গিয়ে দেখি, নিজেরাই কফি তৈরি করেছেন। প্রতি ঘরে কফি তৈরির ব্যবস্থা আছে। কফি খেতে খেতে জন বললেন, কী মনে হচ্ছে? কাউয়াই স্বর্গোদ্যান না?

স্বীকার করলাম।···অবশ্যই মিঃ নর্থব্রুক। এমন জায়গা থাকতে পারে, ভাবিনি। তাছাড়া···

কথা কেড়ে বব বলল, তুমিও আমার মতো ওঁকে আংকল জন বা জনখুড়ো বলতে পারো জায়েণ্টো! তাতে উনি রাগ করবেন না।

জনখুড়ো হাসিমুখে বললেন, মোটেও রাগ করব না। তুমিও আমার ভাইপোর বয়সী জয়ন্ত!

বললাম, আপনি তো দিব্যি জয়ন্ত উচ্চারণ করতে পারছেন, কিন্তু বব আমাকে জায়েণ্টো বানিয়ে ছাড়ল। অথচ আমি জায়েণ্টো বা দৈত্যের এক শতাংশও নই।

এই সময় দেখলাম, বব সিগারেটের প্যাকেট বের করে খুড়োর দিকে বাড়িয়ে দিল। আমার চোখে এটা দৃষ্টিকটু। গুরুজনদের সিগারেট দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের সামনেও আমরা ভারতীয়রা সিগারেট খাই না। কিন্তু সায়েবদের রীতিনীতি আলাদা। জন সিগারেট নিলেন। বব আমার দিকে এগিয়ে দিল প্যাকেট। বললাম, ধন্যবাদ বব। আমি আলাদা ব্রাণ্ডের সিগারেট খাই। আমার কড়া সিগারেট পছন্দ।

বলে পকেট থেকে আমার সিগারেটকেস বের করলাম।

জনখুড়ো আমার সিগারেটকেসটার দিকে তাকিয়েই কেমন যেন চমকে উঠলেন। তারপর খপ করে ওটা প্রায় কেড়ে নিয়ে উল্টে-



পাল্টে দেখতে থাকলেন। আমি তো হতভম্ব। বব মিটিমিটি হেসে বলল, দেখছ কী জায়েণ্টো! খুড়ো তোমার সিগারেটকেসটির মধ্যে নিশ্চয় হাজার-হাজার বছরের পুরনোর ইতিহাসের গন্ধ পেয়ে গেছেন! খুড়োমশাই প্রাচীন ইতিহাসের দিগগজ পণ্ডিত কি না। দেখবে, হয়তো তোমার সিগারেটকেস নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার বক্তৃতা দিতে দৌড়ুবেন।

ভাইপোর তামাশার দিকে মন নেই জনখুড়োর। সিগারেটকেসটা খুলে উনি সিগারেটগুলো বের করে টেবিলে রাখলেন। তারপর জানলার কাছে গিয়ে ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, হুম! জয়ন্ত, এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে? নিশ্চয় লসএঞ্জেলিসের কোন কিউরিও শপে?

বললাম, না খুড়োমশাই। কিউরিও শপের জিনিসের দাম দেবার পয়সা কোথায় আমার? সিগারেটকেসটা আমি পয়সা দিয়ে কিনিনি। ওটা আমার এক বাল্যবন্ধুর উপহার।

জনখুড়ো উত্তেজিতভাবে বললেন, বাল্যবন্ধু! কে সে বাল্যবন্ধু?

বললে কি চিনবেন? হাসতে হসতে বললাম। সে থাকে পশ্চিমবঙ্গের এক অজ পাড়াগাঁয়ে। নিছক চাষাভুষো মানুষ। গাঁয়ের পাঠশালায় আমার সঙ্গে দিনকতক অ আ ক খ শিখেছিল। তারপর পড়া ছেড়ে বাবার সঙ্গে জমি চষতে গিয়েছিল। আর পড়াশোনা হয়নি তার। বছর দুই আগে কলকাতা থেকে গাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম—তখন সে এটা উপহার দিয়েছে।

জন নর্থব্রুক আমার মুখোমুখি বসে তেমনি উত্তেজনায় প্রশ্ন করলেন, আশ্চর্য! সে কোথায় পেল এ জিনিস?

মাঠে জমি চাষ করতে গিয়ে লাঙলের ফালে এটা মাটির তলা থেকে উঠে এসেছিল। এবার একটু গম্ভীর হয়েই জবাব দিলাম। আমার বিস্ময়টা বেড়ে যাচ্ছিল, তাই।

জনখুড়ো চিন্তিতভাবে বললেন, এ বড় আশ্চর্য জয়ন্ত! এখন

আমার মনে হচ্ছে, যেন তোমার এই কাউয়াই দ্বীপের হায়েনা উপনগরীতে ছুটে আসার মধ্যে নিয়তির অনিবার্য টান টের পাচ্ছি। জয়ন্ত, এই সিগারেটকেস এখানকারই পলিনেশীয় জাতির লোকেরা তৈরি করে। এই দেখ, খুদে হরফে লেখা আছে 'মেড ইন হায়েনা'। কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, এর গায়ে প্রাচীন পলিনেশীয় ভাষায় লেখা কয়েকটা কথা। 'আহোয়ায়ালোয়া।' তার পাশে দেখতে পাচ্ছ এই চিহ্নটা? একটা ত্রিভুজের মাথায় যেন চন্দ্রকলা আঁকা। বড় রহস্যময় ব্যাপার জয়ন্ত! আমি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

খুড়ো মুঠোয় সিগারেটকেসটা আঁকড়ে ধরে চোখ বুজে কী যেন ভাবতে লাগলেন। বব আমার দিকে চোখ টিপে কী ইশারা করল এবং মিটিমিটি হাসতে লাগল।

চোখ খুলে জনখুড়ো বললেন, কাছিমজাতীয় একরকম সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা থেকে এসব সিগারেটকেস তৈরী করে ওরা। আমার চোখে পড়েছিল ওই ত্রিভুজের মাথায় চন্দ্রকলা চিহ্নটা। এটা এই দ্বীপের আদিম রাজার প্রতীকচিহ্ন। আর 'আহোয়ায়ালোয়া' কথাটার মানে 'এর ভেতরে গোপন বৃত্তান্ত আছে।' আমি বুঝতে পারছি না, এটা ভারতের একটা গ্রামের মাঠে চাষের জমিতে কীভাবে গেল?

আমিও ব্যাপারটা ভাবছিলাম। এতক্ষণে হদিস মিলে গেল। বললাম, জনখুড়ো! একটা যোগাযোগ খুঁজে পেয়েছি মনে হচ্ছে। আমাদের গ্রামের যে মাঠে জিনিসটা আমার চাষীবন্ধু কুড়িয়ে পেয়েছিল, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা সামরিক বিমানঘাঁটি বানানো হয়েছিল। তখন আমি নেহাত বাচ্চা। শুনেছি, একদিন একটা ছোট্ট প্লেন কীভাবে সেখানে আছড়ে পড়েছিল নামবার সময়। প্লেনটায় আগুন ধরে যায়। পাইলট বা তার সঙ্গীরা কেউ বাঁচেনি। এখন মনে হচ্ছে, এই সিগারেটকেসটা তাদেরই কারুর কাছে ছিল। যেভাবে হোক, ওটা ধ্বংসস্তূপে টিকে গিয়েছিল। তারপর

বিমানঘাঁটিটা যুদ্ধের শেষে উঠে যায়। অনেকবছর পরে জমিতে চাষ পড়ে। তখন সিগারেটকেসটা বেরিয়ে আসে লাঙলের ফলায়।

জন সায় দিয়ে বললেন, ঠিক ঠিক। বোঝা গেল সব। এ নিশ্চয় কোনো আমেরিকানের কাছে ছিল। কিন্তু জয়ন্ত, আবার বলছি— যেন তুমি নিয়তির টানেই ছুটে এসেছ হায়েনাতে। কারণ হায়েনার আদিম রাজার প্রতীক-চিহ্ন আঁকা সিগারেটকেস তোমার কাছে।

ভয় পেয়ে বললাম, ওরে বাবা! নিয়তি-টিয়তি শুনলে বুক ঢিপ-ঢিপ করে কাঁপে যে!

বব বলল, খুড়ো! ওই হোয়া হোয়া হোয়া ব্যাপারটা কী বলছিলেন যেন?

জন বললেন, তামাশা নয় বব! কথাটার মানে 'এর ভেতরে গোপন বৃত্তান্ত আছে।' তার মানে এই সিগারেটকেসটার ভেতর আদিম রাজা হোলাহুয়া সংক্রান্ত কোনো গোপন বিবরণ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা সেই প্লেন দুর্ঘটনার সময় নষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা···

বাধা দিয়ে বললাম, জনখুড়ো! আমার চাষীবন্ধু বলেছিল এর ভেতর দলাপাকানো শক্ত কিছু জিনিস ছিল। সেগুলো সে ধুয়ে সাফ করেছিল।

জন বললেন, হুঁ। যা ভেবেছি, তাই

বব বলল, দলাপাকানো শক্ত জিনিসগুলো সিগারেট ছাড়া কিছু নয়।

জন ভাইপোর দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ। তাও হতে পারে। জয়ন্ত, জিনিসটা আমি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তোমার কি আপত্তি আছে?

আমি বলার আগেই বব বলে উঠল, জায়েন্টো খুব ভাল ছেলে। ওর কোনো আপত্তি নেই। আপনি ওটা নিয়ে গবেষণায় লেগে যান। ততক্ষণ আমি জায়েন্টোকে নিয়ে একবার চক্কর দিয়ে আসি।

জনখুড়ো গম্ভীর মুখে বললেন, যেখানে যাবে যাও, গুহা-টুহায়

যেন ঢুকো না। সাবধান। আর জয়ন্ত, ও যদি কোনো গুহায় ঢুকতে চায়, তুমি ওর চুল খামচে ধরে ঠেকাবে। বব চুলে জব্দ।

বব তার মাথায় লম্বা মেয়েলি চুলগুলো দুহাতে ঢেকে বলল, জায়েণ্টো, আমার চুলে কিন্তু বিদ্যুৎ আছে। শক মারবে। ছুঁয়ো না।

বলে সে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে বাইরে নিয়ে গেল।...

•

আংকল ড্রাম

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের নভেম্বর-শেষের আবহাওয়া ভারি মনোরম। কলকাতারই নভেম্বরের মতো। কিন্তু হুট করতেই বৃষ্টির বড় উপদ্রব। বেরুলাম যখন, তখন চারদিকে ঝলমল করছে বিকেলের গোলাপী রোদ্দুর। সমুদ্রের দিকটা অবশ্য ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে চড়াই-উৎরাই রাস্তা। রেলিংঘেরা ফুটপাথের ধারে নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। ফুলে ফুলে ছয়লাপ, যেদিকে তাকাই। নিচের উপত্যকায় ঘন নারকেলবন। চোখ জুড়িয়ে যায়। রাস্তায় পায়ে হাঁটা লোক কিছু কিছু চোখে পড়ছিল। পৃথিবীর নানা দেশের পর্যটক ওরা। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন অধিবাসী পলিনেশীয়রা খুব সেজেগুজে ঘুরছে। ওদের মেয়েদের গায়ে ফুলের পোশাক। চওড়া ফুটপাতে বা কোথাও ছোট্ট পার্কে ওরা নাচছে-গাইছে। পুরুষরা বাজনা বাজাচ্ছে। ভিড় জমে আছে। যেতে যেতে হঠাৎ কোত্থেকে বৃষ্টি এসে গেল। দেখলাম বৃষ্টিতে ভিজতে সবাই ভালবাসে। আমি আর বব বাদে।

বব আমার হাত ধরে টানতে টানতে দৌড়ুল। একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলাম। ঢোকার সময় অবাক হয়ে দেখলাম, কয়েকটা ভাষার সঙ্গে বাংলাতেও বড় বড় হরফে লেখা আছে : ঢাকুচাচার রেস্তোরাঁ। পাশে ইংরেজিতে : আংকল ড্রামস রেস্তোরাঁ।

বললাম, বব ! বব ! এটা বাঙালী রেস্তোরাঁ দেখছি !

বব বলল, তাই বুঝি ?

ভেতরে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড ভুঁড়িওলা বেঁটে একটা লোক তম্বি করছিলেন ইংরাজিতে। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথায় বিশাল টাক। দেখামাত্র আমার প্রিয়তম বন্ধু সেই প্রখ্যাত 'বুড়োঘুঘু' কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কথা মনে পড়ে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। হায় কর্নেল ! তুমি কোথায়, আর তোমার চিরনেওটা জয়ন্তই বা কোথায় ? মাঝখানে দু-দুটো মহাসাগরের ব্যবধান—প্রশান্ত মহাসাগর আর ভারত মহাসাগর।

বব ফিসফিস করে বলল, এ দেখছি আরেক আংকল ! আমার আংকল জন, আর তোমার তাহলে এই বাঙালী আংকল ড্রাম। সত্যি ড্রাম বটে। ড্রামের মতো গমগম করে বাজছে শোনো !

প্রকাণ্ড পিপে-মানুষটা আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন কাউন্টার থেকে। পায়ের চাপে মাটি কাঁপার কথা। কিন্তু মেঝেয় পুরু নরম কার্পেট। কোনার দিকে ছোট্ট মঞ্চে বাজনাপার্টি বসে আছে সেজেগুজে। অবাক হয়ে দেখলাম, মাইকের সামনে একটা শাড়িপরা বাঙালী মেয়ে এসে দাঁড়াল। তারপর মিঠে গলায় বাংলায় ভাটিয়ালি গেয়ে উঠল। তন্ময় হয়ে গেলাম। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এসে বাংলার ভাটিয়ালি শুনব কে ভেবেছিল ?

পিপেমানুষটা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। পা থেকে মাথা অব্দি গমগমে গলায় এবং বিরাট হাসি মিশিয়ে বলে উঠলেন, ঢাকা না কইলকাত্তা ?

কলকাতা।

প্রকাণ্ড দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, হঃ। গন্ধ পাইয়াই বুজছি। আহা রে ! কতকাল বাদে ভাইপোডারে পাইলাম। আয়েন, আয়েন। আর শোনেন, আমারে চাচা কইবেন। ঢাকুচাচা।

তারপর ববকে দেখিয়ে বললেন, এ হালারে জোটাইলেন ক্যান?

মাইয়ামাইনষের লাখন চুল রাখছে মাথায়। হালা বুত মা প্যারত ? মারকিনগুলান, বোঝলেন ? ব্যাবাক জংলী।

বব কিছু আঁচ করছিল। ঢাকুচাচা এবার তার হাত নিয়ে জোরালো হ্যাণ্ডশেক করে নিজস্ব ইংরেজিতে বললেন, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। আই অ্যাম ইওর আংকল ড্রাম!

বব মুচকি হেসে বলল, আমার একজন আংকল আছে। তবে জোড়া আংকলে আপত্তি নেই।

কাচের দেওয়ালের পাশে আমাদের বসিয়ে ঢাকুচাচা গল্প করতে লাগলেন। তাঁর নাম মুজঃফর হোসেন। ডাক নাম তার ঢাকু মিয়া। বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। সতের বছর ধরে নানা ঘাটের জল খেয়ে এই হায়েনাতে এসে জুটেছেন। পয়সাকড়ি হয়েছে। মা-মরা মেয়ে জ্যোৎস্নাকে এনেছেন গত বছর। ঢাকায় মামার কাছে থাকত এতদিন। জ্যোৎস্না ভাল গাইতে পারে। এই এক বছরে নানাভাষায় গান শিখেছে সে। যে দেশের গান গায়, সেই দেশের পোশাক পরে। ঢাকুচাচা বললেন, জ্যোৎস্না আইয়া আমার রেস্তোরাঁর বিক্রিবাটা খুব বাড়ছে। হঃ। আর আমার চিন্তা নাই। মাইয়াডার হাত্তেও রেস্তোরাঁর ভার দিয়া বাইরে ঘোরনের ফুরসত পাই কাইল সকালে আসেন ভাইপো। আপনারে লইয়া বাইরামু।

চারমাস পরে বাংলায় মন খুলে কথা বলতে পেরে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। একটু পরে চাচা তাঁর মেয়েকে ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দিলেন। জ্যোৎস্না ফুটফুটে সুন্দরী। মাথার চুল ববছাঁট। ভারি মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। এক সময় সে আমাকে অবাক করে বলে উঠল, আচ্ছা। এবার বলুন, আপনি একা কেন কাউয়াই দ্বীপে ? সঙ্গে আপনার কর্নেল নেই কেন ?

হাঁ করে আছি দেখে সে বলল, বারে! জয়ন্ত চৌধুরী আর কর্নেলের অ্যাডভেঞ্চার আমি পড়িনি বুঝি ? কলকাতায় আমার মাসির বাড়ি। যখন গেছি, একগাদা করে বই কিনে নিয়ে

গেছি ঢাকায়। আমি অ্যাডভেঞ্চার আর গোয়েন্দা-কাহিনীর পোকা।

প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে পাঠিকা পেয়ে যাওয়া আমার পক্ষে খুব আনন্দের! ববকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে সে প্রশংসার চোখে আমাকে দেখতে লাগল। চাচা কাউন্টারে চলে গেছেন। রেস্তোরাঁয় ভিড় বাড়ছে ডিনার খেতে। এখানে লোকের ছটার মধ্যে ডিনার খাওয়া অভ্যাস। বব উসখুস করছে দেখলাম।

জ্যোৎস্না বলল, আপনাকে জয়ন্তদা বলছি। রাগ করবেন না তো?

না, না, নিশ্চয় বলবে।

জ্যোৎস্না চোখে হেসে রহস্যময় ভঙ্গী করে চাপা গলায় বলল, নিশ্চয় হায়েনার কোন গুহায় গুপ্তধনের সূত্র পেয়ে পাড়ি জমিয়েছেন। এবং যেখানে জয়ন্ত চৌধুরী, সেখানেই কর্নেল। কাজেই বুঝতে পারছি, কর্নেল একা কিছু তদন্ত করতে বেরিয়েছেন।

না জ্যোৎস্না! সত্যি বলছি, উনি আসেন নি।

জানি, গোয়েন্দাদের সব কথা গোপন রাখার নিয়ম। তবে জয়ন্তদা আমাকে সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু। আমি জানি···বলে সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে শেষে ববের দিকে তাকাল। ইংরজীতে বলল, মিঃ বব! আশা করি কিছুক্ষণ মাতৃভাষায় আমাদের আলাপে তোমার অসুবিধে হচ্ছে না। জরুরী কথাটা সেরে নিয়ে আমরা সবাই এবার ইংরেজীতেই বলব। আমরা বন্ধুর মতো। কেমন?

বব ফিক করে হেসে বলল, ওক্কে ওক্কে বেবি! তোমরা জরুরী কথাটা সেরে নাও। আমি আমার জনখুড়োকে ফোনে জানিয়ে দিয়ে আসি, আমরা ডিনারটা এখানেই সেরে নিচ্ছি। উনি যেন নিজেরটা কোথাও সেরে নেন।

বব ফোনের দিকে এগিয়ে গেল। জ্যোৎস্না বলল, যা বলছিলাম জয়ন্তদা। এখানে একবছর আছি। মিনিহুন নামে খুদে মানুষদের কথা শুনেছি। তারা নাকি গুহার ভেতর থাকে। খুব

দুর্গম সে-সব গুহা। ওরা সমুদ্রে মাছের মতো ঘুরতে পারে নাকি। তাই সমুদ্রের তলা থেকে দামী মণিমুক্তা কুড়িয়ে এনে গুহার ভেতর লুকিয়ে রাখে। বছরের পর বছর জমানো সেইসব রত্নের নাকি পাহাড় জমিয়ে রেখেছে ওরা গুহার ভেতর পাতালপুরীতে। রত্নগুলো সূর্যের মতো আলো ছড়ায় সেখানে। পাতালপুরীতে তাই একটুও অন্ধকার নেই। সারাক্ষণ ঝকমকে রোদ্দুর!

হাসতে হাসতে বললাম, রূপকথা বলছ জ্যোৎস্না!

জ্যোৎস্না মাথা নেড়ে বলল, মোটেও না। এখানকার পলিনেশীয়রা এসব দারুণ বিশ্বাস করে। আমাদের তিনজন পলিনেশীয় পরিচারক আছে—দুজন মেয়ে, একজন ছেলে। ওই যে ওরা। দেখছেন তো? ওদের কাছে শুনেছি, কাউয়াই দ্বীপের এক রাজা ছিল। একমাত্র তাকেই নাকি মিনিহুনরা খাতির করত। রাজাকে একবার ওরা নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল পাতালপুরীতে।

বললাম, ঠিক আছে। যদি সেই পাতালপুরীর খোঁজে বেরোই, তোমাকেও ডাকব। তবে আপাতত আমাকে মাছের ঝোল আর ভাত খাওয়াও তো লক্ষ্মী মেয়ে! চারমাস আমি অখাদ্য খেয়ে কাটাচ্ছি।

জ্যোৎস্না নেচে উঠল।…এক্ষুনি। আমাদের নিজেদের জন্যে ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত আছে।

ইলিশ! বলো কী? প্রশান্ত মহাসাগরের ইলিশ নাকি?

উঁহু খাঁটি পদ্মার ইলিশ। মাসে একবার আসে চট্টগ্রাম থেকে। …বলে জ্যোৎস্না প্রায় দৌড়ে চলে গেল। আমার নোলায় জল ঝরার অবস্থা। শুধু চিন্তা, বব বাঙালী খাদ্য খেতে পারবে তো?

দুটি রহস্যময় গুহা

কোকো পাম হোটেলে পৌঁছুতে আরেকদফা ভিজে গেলাম বৃষ্টিতে। চাচা বলছিলেন, শীতকালটা বেজায় বৃষ্টি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। তাই এখন পর্যটকদের ভিড় বছরের অন্য সময়ের তুলনায় কম।

নিজের ঘরে ঢুকে জামাকাপড় বদলে নিলাম। তারপর ববদের ঘরের দরজায় নক করলাম। ববও পোশাক বদলেছে। ভিজে চুল এমন করে ঘষেছে যে আলুথালু ভয়ংকর দেখাচ্ছে। সে চিরুনী হাতে বাথরুমে ঢুকে গেল। জনখুড়ো টেবিলের সামনে বসে ধ্যান করছিলেন যেন। আমার সাড়া পেয়ে বিড়বিড় করে দুটো শব্দ আওড়ালেন: ওয়েইকাপালি! ওয়েইকানালোয়া!

তারপর ঘুরে একটু হাসলেন।···বসো জয়ন্ত। 'আহোয়ায়ালোয়ার' রহস্য কিছুটা ভেদ করতে পেরেছি মনে হচ্ছে। পলিনেশীয় ভাষা আমি অল্পস্বল্প জানি। হুম্, তোমার সিগারেটকেসের ভেতরে দুদিকে অনেক কিছু লেখা আছে। তোমার চাষীবন্ধু এটা সাফ করার জন্য এমন ঘষা ঘষেছিল যে অনেক জায়গার খোদাই করা লেখা মুছে গেছে। আহা, সব যদি অক্ষত থাকত, পুরোটা পড়তে পারতাম। যাক্ গে, যা হবার হয়েছে। যেটুকু পড়া যাচ্ছে, তার সূত্র ধরে এগোলে আমরা দারুণ কিছু আবিষ্কার করতে পারব।

বললাম, একটু আগে কী দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন জনখুড়ো?

হুম্! ওয়েইকাপালি। ওয়েইকানালোয়া।

এর মানে কী?

হায়েনার দুটো গুহার নাম। নামদুটো সিগারেট কেসের ভেতর লেখা আছে। কিন্তু তার চেয়ে কাজের কথা হচ্ছে, রাজা হোলাহুয়ার বংশের কেউ এখন এখানে আছে কি না খুঁজে বের করতে হবে।

ঢাকুচাচার মেয়ে জ্যোৎস্নার মুখে যে পাতালপুরীর কথা শুনেছি, জনখুড়োকে বললাম। খুড়ো এ কিংবদন্তীর কথা সবাই জানেন। বললেন, ওটা নিছক কিংবদন্তী। মিনিহুন বা রত্নপুরী কোনটাই আমি বিশ্বাস করি না বাপু।

তাহলে সিগারেটকেসে কিসের গোপন বৃত্তান্ত থাকতে পারে? কী লেখা আছে দেখলেন?

খুড়ো হাসলেন। যা লেখা আছে, তা ততকিছু প্রাচীন ব্যাপার নয়। যদিও ভাষা এবং হরফগুলো প্রাচীন পলিনেশীয়। কী লেখা আছে, তা আমি অবিকল অনুবাদ করেছি। এই দেখ।

জনখুড়ো একটা কাগজ দিলেন। তাতে লেখা আছে :

টিহো বিশ্বাসী। টিহো রাজবংশীয়। যদি আমরা মারা যাই, টিহো এবং মারি হায়েনা···ওয়েইকাপালি ওয়েইকানালোয়া··· দক্ষিণ সাত গজ পূর্ব দু ফুট বাঁদিকে কবচ···অসবোর্ন এবং পিটার ওলসন এফ এফ আর ৫০৩৭···জি ২২১৩···

পড়ার পর বললাম, শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, অসবোর্ন আর ওলসন নামে সম্ভবত দুজন মিলিটারি পাইলটের এই সিগারেটকেস। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের মাঠে বিমানঘাঁটিতে তাদের প্লেনটাই ধ্বংস হয়ে থাকবে।

তুমি বুদ্ধিমান জয়ন্ত! জনখুড়ো প্রশংসার চোখে তাকিয়ে বললেন। ঠিকই ধরেছ। কালই আমি ওয়াশিংটনের সামরিক রেকর্ড দফতরে ফোন করে অসবোর্ন এবং ওলসনের খোঁজ করব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব সামরিক দলিল ওখানে রয়েছে। আমার ধারণা, হায়েনার দুটো গুহায় ওরা কিছু লুকিয়ে রেখেছিল। তখন ভীষণ যুদ্ধ চলেছে। যে-কোনো সময় ওরা মারা পড়তে পারে। তাই সিগারেট কৌটোয় পলিনেশীয় ভাষায় গোপন হদিস খোদাই করে রেখেছিল।

বললাম, রাজবংশীয় জনৈক টিহোর কথা আছে ওতে। কেন?

জন বললেন, এই টিহো ওদের সঙ্গী ছিল সম্ভবত। অর্থাৎ টিহো ব্যাপারটা জানত। ওদের নিশ্চয় ইচ্ছে ছিল, টিহোকে সিগারেটকেসটা দেবে। ওরা যুদ্ধে মারা পড়লে টিহো···

জন হঠাৎ থামলেন। চিন্তিতমুখে ফের বললেন, বাকি কথাটা অস্পষ্ট। শুধু বলা যায়, ওরা মারা পড়লে টিহো কাউকে সিগারেট-কেসটা পাঠিয়ে দেবে এমন নির্দেশ ছিল। কিন্তু যে-কোনো কারণে হোক, টিহোকে ওরা জিনিসটা দিয়ে যেতে পারেনি।

মনে একটা মতলব এঁটে বললাম, খুড়োমশাই! আপনার অনুবাদটার একটা কপি পাব কি? আমি ওটা নিয়ে একটু ভাবনা-চিন্তা করতে চাই।

আলবাৎ, আলবাৎ। জনখুড়ো বললেন।···সিগারেট কেসটা তো তোমার সম্পত্তি।

বব কথা শুনছিল বাথরুমে। মুখ বাড়িয়ে বলল, খুড়ো! জায়েন্টো ছদ্মনামে গোয়েন্দাকাহিনী লেখে জানেন? অসংখ্য বই লিখেছে। ক্যালকুট্টা থেকে ডেক্কা পর্যন্ত ওর নাম।

বলো কী জয়ন্ত? জন নড়ে উঠলেন।

বললাম, হ্যাঁ খুড়োমশাই। গোয়েন্দাগল্প আর অ্যাডভেঞ্চার লিখতে লিখতে এমন অভ্যাস হয়েছে, সুযোগ পেলে সত্যিকার রহস্যেও মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে।

খুব ভাল কথা। খুব ভাল কথা। জনখুড়ো একটা কাগজে ওঁর অনুবাদ কপি করলেন। সেটা আমাকে দিয়ে বললেন, অসবোর্ন আর ওলসন ভারি এলেমদার লোক ছিল, বুঝলে? যে হরফে ওরা লিখেছে, তা কবে লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন রোমান হরফে পলিনেশীয় ভাষা লেখা হয়। তুমি শুনলে অবাক হবে, এই আদিম পলিনেশীয় লিপি হচ্ছে চিত্রলিপি। ছবির রেখায় কথা বোঝানো। তোমাদের সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল আছে। তার আগে প্রাচীন পলিনেশীয় সভ্যতা সম্পর্কে তোমার জানা দরকার।

বব মুখ বাড়িয়ে চোখ টিপল আমাকে। বুঝলাম, সাবধান করে দিচ্ছে। কারণ ওর অধ্যাপক খুড়ো আমার কান ঝালাপালা করে দেবেন বুঝতে পেরেছে। আমিও কি বুঝিনি? বেরসিকের মতো উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, খুড়োমশাই! কিছু মনে না করেন তো বলি, আমার বেজায় ঘুম পাচ্ছে। কাল সব শুনব বরং।

খুড়ো মনমরা হয়ে বললেন, আচ্ছা।

আমেরিকানদের টেলিফোন ব্যবস্থা খাসা। কাউয়াই দ্বীপেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পনের মিনিটের মধ্যে কলকাতার লাইন পেয়ে গেলাম। তারপর সুপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কান জুড়িয়ে গেল।

সেই আগস্টমাসে আমেরিকা এসেছি। তারপর বারতিনেক ট্রাংককলে বুড়োঘুঘুমশাইয়ের খবর নিয়েছি। উনি পাখি-প্রজাপতি-পোকামাকড় ক্যাকটাস নিয়ে মেতে আছেন আগের মতো। ইদানীং খুনখারাপি বা রহস্যে টান নেই। ওঁর মতে, পৃথিবী দিনেদিনে রহস্য-হীন হয়ে পড়েছে। আজকাল খুনীরা সবার সামনে খুনখারাপি করে। আগের দিনে খুনীরা ছিল ভীষণ ভীতু। কত সাবধানে খুন করত। তাদের খুঁজে বের করা কঠিন হত। আজকালকার খুনী ড্যামকেয়ার। কাজেই রহস্য-টহস্য নেই এসব জিনিসে। এদিকে অ্যাডভেঞ্চারও বিজ্ঞানের দৌলতে শস্তা হয়ে গেছে। দুর্গম বলে কোনো জায়গা নেই। আর গুপ্তধন? কর্নেলের ধারণা, সব গুপ্তধন মানুষ হাতিয়ে নিয়েছে দিনে দিনে। গুপ্তধন বলতে এখন করফাঁকি দিয়ে জমানো কালো টাকা। এসব কাজ আয়কর দফতরের লোকেরাই করে। কাজেই ওসব ছেড়ে কর্নেল প্রকৃতির রহস্যভেদে মন দিয়েছেন।

কর্নেল ফোনে মিঠে গলায় বললেন, সুখবর আছে ডার্লিং! তোমার পাঠানো আরিজোনা অঞ্চলের মরু ক্যাকটাসে কুঁড়ি গজিয়েছে। তুমি ফিনিক্সে ফের গেলে আরও একটা ক্যাকটাস পাঠাবে।

বললাম, তিনমিনিট পরে লাইন কেটে দেবে। ঝটপট লিখে নিন, যা বলছি। কাগজকলম নিন। নিয়েছেন? লিখুন: "টিহো বিশ্বাসী। টিহো রাজবংশীয়···"

পুরোটা বললাম। তারপর কর্নেল আমাকে অবাক করে বললেন, প্রশান্তমহাসাগরের জলকল্লোল কানে আসছে, ডার্লিং। তুমি কি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ?

হ্যাঁ। হাওয়াই দ্বীপে। ম্যাপে দেখে নিন। হায়েনা উপনগরীর কোকোপাম হোটেলে আছি।

জয়ন্ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হায়েনায় আমি একসপ্তাহ ছিলাম। জাপানী বোমায় আহত হয়ে···

আপনি সর্বচর। শুনুন, যা লিখে নিয়েছেন, তাতে সাংঘাতিক রহস্য আছে। ফোনে সব জানানো সম্ভব নয়। আপনি···

ডার্লিং! হায়েনাতে যখন আছ, তখন আশা করি মেনেহিউন বা মিনিহুন দেখতে ভুলো না। তিনফুট উঁচু, বানরাকৃতি মানুষ। কুচকুচে কালো। অথচ ওদের নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি আছে। জয়ন্ত! শুনতে পাচ্ছ তো ?

আমি বিছানায় বসে ফোন করছিলাম। হঠাৎ কেউ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাতে আমার প্যাণ্টসুদ্ধ ডান পা চেপে ধরল। দেখি কালো ছোট্ট একটা হাত—অতি কদর্য সেই হাত। শিরা ফুলে আছে। এমন ঠাণ্ডা যে প্যাণ্ট ও গরম মোজাও বরফ করে ফেলেছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আরে! একি!

ফোন তখনও কানে। কর্নেল বললেন, কী হল ডার্লিং ? মিনিহুন নাকি ?

আর কথা বলার ফুরসত পেলাম না। আমার ঠ্যাং ধরে হ্যাঁচকা টান মারল কালো খুদে হাতটা। ফোন পড়ে গেল বিছানায়। আমি গড়িয়ে মেঝের কার্পেটে পড়লাম। তারপর চেঁচিয়ে উঠলাম, বব! বব!

ঘরে টেবিলবাতির আলো শুধু। মেঝেতে পড়ে থাকতে থাকতে দেখলাম, কী একটা কালো বাঁদরজাতীয় প্রাণী দুপায়ে দৌড়ে গিয়ে বাথরুমের দরজা খুলল—অবিকল মানুষ যেমন খোলে। তারপর ভেতরে ঢুকে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে বাথরুমের দরজার হাতল ঘুরিয়ে লক করে দিলাম। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জনখুড়োকে ধাক্কা দিলাম।

খুড়ো-ভাইপো আমার ধাক্কার চোটে একসঙ্গে মুণ্ডু বের করে বললেন, কী হয়েছে, কী হয়েছে?

দম আটকানো গলায় বললাম, মিনিহুন কিংবা মেনেহিউন! আমার ঘরে!

বব হিহি করে হেসে উঠল। জনখুড়ো বেরিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিলে জয়ন্ত!

বব বলল, দুঃস্বপ্ন।

ব্যস্তভাবে বললাম, শিগগির আমার সঙ্গে আসুন! বিদঘুটে জীবটাকে বাথরুমে বন্দী করে ফেলেছি।

ওরা দুজনে তখুনি আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। বাথরুমের দরজার সামনে দুধারে খুড়ো-ভাইপো আস্তিন গুটিয়ে জীবটাকে পাকড়াও করার জন্য হুমড়ি খেয়ে বসলেন। আমি যা থাকে বরাতে বলে দরজার লকটা ঘুরিয়ে খুলে ফেললাম। তারপর দরজার পাশের সুইচ টিপে দিলাম।

বাথরুম উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। কিন্তু হতচ্ছাড়টা গেল কোথায়? বাথরুমের মেঝেতে পুরু কার্পেট। সামনে প্রকাণ্ড বেসিন ও আয়না। একধারে কোমোড, অন্যধারে ঝকমকে বাথটাব। বাথটাবের পর্দাটা যথারীতি গোটানো রয়েছে। মিনিহুন হোক আর যেই হোক, একটা আরশোলারও লুকোবার জায়গা নেই বাথরুমে। তাহলে ব্যাপারটা কী হল?

খুড়ো-ভাইপো এবার খ্যা খ্যা করে বেজায় হাসতে লাগল। লজ্জায় পড়ে গেলাম।

জন বললেন, মাই গুডনেস! বুঝতে পেরেছি তুমি কেন গোয়েন্দা গল্প আর অ্যাডভেঞ্চার লেখো! জয়ন্ত, তুমি সত্যি বড় কল্পনাপ্রবণ।

বব আমাকে একহাত জিভ দেখাল অর্থাৎ ভেংচি কাটল। হতভম্ব হয়ে বললাম, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি কলকাতায় ট্রাংককল করছিলাম, জন্তুটা ঠাণ্ডা হাতে আমার পা খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান মেরেছিল। দেখতে পাচ্ছেন না ফোনটা এখনও বিছানায় উল্টে পড়ে রয়েছে?

জন ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বব আগের মতো গম্ভীর মুখে বলল, দুঃস্বপ্ন।

হঠাৎ জন কান খাড়া করলেন। তারপর ঘুরে দেয়ালের ওপর দিকে তাকালেন। তারপর একটু হেসে বললেন, হুম! জয়ন্ত কি বাথরুমে ঢুকে সমুদ্র গর্জন শুনতে ভালবাসো?

আমি চমকে উঠলাম। সত্যি তো, পেছনের খাড়ি থেকে গম্ভীর সমুদ্রগর্জন শোনা যাচ্ছে। হাজার ফুট নিচে পাথরের দেয়ালে ধাক্কা মেরে প্রশান্ত মহাসাগর মুহুর্মুহু গর্জন করছে।

ওপরে তাকিয়ে দেখি, দেয়াল ও ছাদের মাঝামাঝি জায়গায় তিনফুট লম্বা দুফুট চওড়া কাচের লিন্টেল খোলা রয়েছে। জনখুড়ো বললেন, প্রাণীটা ওই পথেই পালিয়েছে, যদি তোমার স্বপ্ন না হয়।

বললাম, কিন্তু আমি তো ওটা খুলিনি।

বব ফিক করে হেসে শিস দিতে দিতে তাদের ঘরে ফিরে গেল। জনখুড়ো বললেন, ওটা আটকে লক করে দাও। খোলা থাকলে তোমার ঘরের হিটিং সিস্টেম কাজ করবে না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে যাবে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলে কানে রাখলাম। লাইন কখন কেটে গেছে। ফোনটা যথাস্থানে রেখে বললাম, তাহলে কি সত্যি আমার ঘরে মিনিহুন হানা দিয়েছিল? কিন্তু এ কী ধরনের রসিকতা ব্যাটাচ্ছেলের বলুন তো খুড়োমশাই? আর বেছে বেছে আমার ঘরেই ঢুকল শেষে?

জন গম্ভীর মুখে বললেন, নিয়তি জয়ন্ত। এর নাম নিয়তি। নিয়তির টানেই তোমাকে ছুটে আসতে হয়েছে হায়েনায়। কারণ তোমার কাছে আছে রাজা হোলাহুয়ার প্রতীকচিহ্ন আঁকা সিগারেটকেস।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা এবং হন্তদন্ত ববের প্রবেশ।

বব বলল, শিগগির আসুন খুড়ো! ঘরে চোর ঢুকেছিল। আমাকে ঘুষি মেরে প্রায় দুমিনিট অজ্ঞান করে ফেলেছিল। জ্ঞান হতেই দেখি চোর ব্যাটা হাওয়া হয়ে গেছে।

জনখুড়ো তাঁর ঘরের দিকে ছুটলেন। আমি এবার আমার ঘরের দরজা বাইরে থেকে লক করে ওদের ঘরে গেলাম।

ঢুকে দেখি, জনখুড়োর মাথায় হাত। বললেন, জয়ন্ত! সর্বনাশ হয়ে গেছে। তোমার সিগারেট কেসটা টেবিলে রেখে আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিলাম। সেটা নেই।

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। বব ফিক করে হেসে বলে উঠল, ওঃ হো! এতক্ষণে বোঝা গেল, এঘরে চোর ঢুকবে বলেই জায়েন্টোর ঘরে মিনিহুন পাঠিয়েছিল! ধন্য ধন্য হে চোর চূড়ামণি! তোমার খুরে-খুরে দণ্ডবৎ হই। ধন্য তোমার বুদ্ধিকৌশল। আঃ! কী ব্যথা কী ব্যথা!

বলে সে তার কালো ছোপ পড়া চোয়ালে হাত রেখে বাথরুমে ঢুকল।···

রাজবংশীয় টিহোর অন্তর্ধান

রাতের ঘুমটা ভাল হয়নি। শোবার আগে খাটের তলা ভাল করে দেখে নিয়েছিলাম। বাথরুমের ভেতরটাও। রাত দেড়টা অব্দি ফের কর্নেলকে ট্রাংককল করার চেষ্টা করেছিলাম। লাইন পাইনি। যতবার ওভারসিজ কল অফিসে করি, টেপরেকর্ডারে

বেজে ওঠে : 'দুঃখিত মশাই। সমুদ্রপারের লাইন এখন ব্যস্ত। আবার চেষ্টা করুন।'

সকালে ঢাকুচাচার মেয়ে জ্যোৎস্না এসে হাজির। এখন আর চেনাই যায় না, পুরো মেমসায়েবটি। সাদা শার্ট আর জিনসের প্যান্ট পরেছে। মাথায় হাওয়াই দ্বীপের হলুদ টুপি।

রাতের ঘটনা শুনে সে আঁতকে উঠল। বলল, এ যে সত্যিকার রহস্যকাহিনী জয়ন্তদা! কিন্তু এবার প্রমাণ হল তো সত্যি মিনিহুন আছে?

বললাম, মিনিহুন কিনা কে জানে! আমার তো মনে হল বাঁদর।

জ্যোৎস্না বলল, যাঃ! বাঁদর কালো হয় নাকি? তাছাড়া বললেন ভীষণ ঠাণ্ডা হাত। হবেই তো। মিনিহুন সমুদ্রেও মাছের মতো ঘুরে বেড়ায় কিনা। এখন নভেম্বরে সমুদ্রের জল ঠাণ্ডা না?

গল্প করতে করতে কফির অর্ডার দিলাম ফোনে। সেইসময় বব ফুলবাবু সেজে ঘরে ঢুকল। নকশাকাটা ঘিয়ে রঙের ঢিলে কুর্তা আর আঁটো জিনস পরা। জ্যোৎস্নাকে দেখে বলল, হাই!

জ্যোৎস্নাও বলল, হাই!

এই হল মারকিন সম্ভাষণ। বব বলল, খুড়োমশাই পুলিশ-দফতরে গেলেন। হোটেলের ম্যানেজার খুব ভয় পেয়ে গেছে। কোকো পামে এই প্রথম চুরি বিশবছর পর। বিশবছর আগে একবার এক পর্যটকের জুতো চুরি গিয়েছিল। এক পাটি কেডস! যাইহোক, বাইরে রোদ্দুরের ফুল ফুটছে। ঘরে বসে থাকার মানেটা কী?

বললাম, বসো। কফি আসছে। খেয়ে বেরুব। তারপর বাংলায় জ্যোৎস্নাকে বললাম, জ্যোৎস্না, তোমার সময় হবে তো?

জ্যোৎস্না বলল, অঢেল সময়। আপনাকে নিয়ে ঘুরে সব দেখাব বলেই তো এসেছি।

বব ভুরু কুঁচকে বলল, তোমরা মাতৃভাষায় আমাকে গাল দিচ্ছ কি?

বললাম, সরি বব! ভুল হয়েছে। আমরা তোমার সামনে বাংলা বলব না। কারণ সেটা অভদ্রতা হয়।

একটু পরে পলিনেশীয় পরিচারিকা কফি নিয়ে এল। কফির সঙ্গে প্রকাণ্ড এক প্লেট বাদাম ফাউ হিসেবে। এ বাদাম, জ্যোৎস্না জানাল, এই স্বর্গোদ্যানেরই ফসল। চিবুলে ছানার স্বাদ পাওয়া যায়। আমার জিভে নারকোল মনে হল। পরিচারিকাটি পলিনেশীয়দের মতোই বেঁটেখাটো মোটাসোটা। গায়ের রং উজ্জ্বল বাদামী। চ্যাপটা মুখ এবং নাকটা সরু। হঠাৎ দেখলে জাপানী মনে হতে পারে। তবে কাল থেকে পথেঘাটে অনেক খাড়ানাক-ওয়ালী মেমসায়েবের মতো মেয়েও দেখেছি—তারাও পলিনেশীয়। কারুর গায়ের রঙ কালোও। কিন্তু সবসময় মুখে হাসিটি লেগে আছে।

জ্যোৎস্না আমাদের অবাক করে পলিনেশীয় ভাষায় ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। মেয়েটি চলে গেলে বললাম, বাঃ জ্যোৎস্না! তুমি ওদের ভাষা শিখে ফেলেছ দেখছি?

জ্যোৎস্না বলল, অল্পস্বল্প। জয়ন্তদা, ওকে জিগ্যেস করলাম টিহো নামে কাকেও চেনো নাকি—আদিম রাজার বংশধর টিহো? ও বলল, টিহো এখানেই চাকরি করে। এ হোটেলের বেল ক্যাপটেন সে। অর্থাৎ পোর্টারদের সর্দার। হোটেলে লোক এলে তার নির্দেশে বেলম্যানরা ব্যাগেজপত্তর ঘরে পৌঁছে দেয়। হোটেল ছাড়লে ঘর থেকে ব্যাগেজ নিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠায়। এসব ওদের দায়িত্ব।

বললাম, জানি। টিহোর কথা কী বলল বলো।

জ্যোৎস্না বলল, টিহোকে সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বব এবং আমি একসঙ্গে বলে উঠলাম, সে কী!

হ্যাঁ। মেয়েটির নাম ওলালা। ওর ধারণা, টিহো সানফ্রান্সিসকোতে তার মারকিন বউটার কাছে ফিরে গেছে। টিহোবুড়োর সংসারটি বেজায় বড়ো সেখানে। একগাদা নাতিপুতিও আছে। সবাই একসঙ্গে থাকে।

বললাম, টিহো বয়সে বুড়ো নাকি ?

জ্যোৎস্না বলল, হ্যাঁ—তাই তো বলল ওলালা।

বব বলল, ওঃ হো ! মনে পড়ছে। রিসেপশানে গম্ভীর চেহারার এক বুড়ো পলিনেশীয়কে দেখেছিলাম। ওহে জায়েন্টো, আমার এ কথাও মনে পড়েছে এতক্ষণে—তুমি রিসেপশানের সামনে দাঁড়িয়ে তোমার রহস্যময় সিগারেট কৌটটা বের করেছিলে এবং সিগারেট টানছিলে।

জ্যোৎস্না চোখ বড়ো করে বলল, তাহলেই সব রহস্য ফাঁস হয়ে গেল জয়ন্তদা। টিহোবুড়ো তখনই জিনিসটা দেখে চমকে উঠেছিল। তারপর···

সে হঠাৎ থেমে কী ভাবতে লাগল। তারপর ফের বলল, দেখুন জয়ন্তদা ! কাল বলছিলাম না আপনাকে ? মিনিহুনরা রাজা হোলাহুয়াকে খুব খাতির করত বলে কিংবদন্তী আছে। আমার মনে হচ্ছে, টিহোর সঙ্গে মিনিহুনদের যোগাযোগ থাকা সম্ভব। একজন মিনিহুনকে সে ডেকে এনেছিল হোটেলে।

বব হাসতে হাসতে বলল, তোমরা বাঙালীরা বড় কল্পনাপ্রবণ জাত। যাকৃগে বাইরে কত রোদ্দুর। ঘরের ভেতর বসে বিদঘুটে আলোচনা করে লাভটা কী ? চলো, বেরিয়ে পড়ি !···

ওয়েই কাপালির ভেতরে

ঝলমলে রোদ্দুরের দিন। তাই খাড়ির মাথায়, পার্কে, কিংবা খাড়ির নীচে যেখানে নেমে যাওয়ার পথ আছে এবং পাথরের চওড়া চাতালে সমুদ্রের জল লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, সেখানে নাচগানের আসর জমে উঠেছে। প্রতি আসরে ফুলের পোশাক পরা পলিনেশীয় মেয়েরা তো আছেই—পৃথিবীর নানা দেশের লোকেরাও রঙীন পলি-নেশী পোশাক পরে নাচছে। আঁতকে উঠলাম দেখে, তোলপাড়

করা জলেও লম্বাটে ছিপনৌকোর মতো ক্যানো ভাসিয়েছে দুঃসাহসীরা।

ববের মারকিন রক্ত লাফিয়ে উঠল সেই দৃশ্যে। বলল, হাই জোস্না! চলো আমরা নীচে নেমে যাই। তারপর একটা ক্যানো ভাড়া করে নাকানিচুবানি খেয়ে আসি।

জ্যোৎস্না বলল, দারুণ জমবে। চলুন জয়ন্তদা।

আমি আঁতকেই ছিলাম। মিনমিনে গলায় বললাম, দেখ জ্যোৎস্না, আমি পশ্চিমবঙ্গের ঘটি। পাহাড়জঙ্গল যদিবা চষে বেড়াতে পটু, জল দেখলেই আমি বেড়ালের মতো ভয় পাই। তুমি বাঙাল মেয়ে। জলের দেশের জলকন্যা। তোমার পক্ষে যা সম্ভব, আমার পক্ষে তা অসম্ভব।

বব খপ করে আমার হাত ধরে বলল, এস। তোমাকে আমরা সাঁতার শেখাব।

জ্যোৎস্না খিলখিল করে হেসে উঠল। বব একটা প্রায়খাড়া ক্ষাটল দিয়ে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। মাধ্যাকর্ষণেরও টান আছে। তাই নীচের একটা চাতালে পৌছতে মিনিট দুইয়ের বেশী লাগল না। অথচ চাতালটা প্রায় হাজার ফুট নিচে।

চাতালের কিনারায় সমুদ্রের জল এসে ফণা তুলছে। ছড়িয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে। কেমন একটা আঁশটে গন্ধ জলের। অসংখ্য সমুদ্রপাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। ডাকাডাকি করছে। জলের গর্জন, পাখির ডাক, তার ওপর হাওয়াইয়ান নাচগান ও বাজনার চোটে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। খাড়িটা প্রায় সিকি কিলোমিটার চওড়া। সামনে তুলকালাম জলে চাপচাপ সাদা ফেনা দুলছে। তার তলায় পাথর আছে। নৌকোর তলা এক ধাক্কায় ফুটো হবার সম্ভাবনা। তার মধ্যে পলিনেশীয় মাঝির হাঁটুঅব্দি নাগাদের মতো রঙীন লুঙিজাতীয় পোশাক এবং মাথায় হলুদ টুপি পরে বৈঠা চালাচ্ছে। ওদের নৌকো চালানোর দক্ষতা দেখে তাক লাগছিল।



জ্যোৎস্না এক ফুলওয়ালীর কাছে একগুচ্ছ ফুল কিনল। তারপর ফুলগুলো মাথায় এবং কোমরে চমৎকার গুঁজে নিল। তখন ওকে মনে হল বাঙাল মেয়েটা এবার পলিনেশীয় মেয়ে হয়ে উঠেছে। বব ক্যানো নৌকা ভাড়া করছিল। দরাদরি করে ঘণ্টায় দশডলারে রফা হল। তার মানে প্রায় আশি টাকা। আমার ইচ্ছে করছিল এবার ভোঁ দৌড় করে পালিয়ে যাই। কিন্তু হাজার ফুট খাড়া চড়াই ভেঙে ওঠা সহজ কথা নয়।

ক্যানোটা জলের ধাক্কায় প্রচণ্ড দুলছে। দুজন পলিনেশীয় মাঝি সামনে পেছনে বসেছে। প্রথমে জ্যোৎস্না নামল। তারপর সে হাত বাড়াল আমার দিকে। বব আমাকে পেছন থেকে এমন ধাক্কা মারল যে আর একটু হলেই জলে পড়তাম। জ্যোৎস্না ধরে ফেলল। তখন টের পেলাম, বাঙাল মেয়েটার গায়ে তো অসম্ভব জোর। রোসো, আমিও খাঁটি ঘটি। তোমার প্রতাপ জলে, আমার ডাঙায়। সময় এলে বুঝিয়ে দেব, এই জয়ন্ত চৌধুরী কী জিনিস।

ক্যানো নৌকার ভেতর প্রাণ হাতে করে বসে রইলাম। উথাল-পাথাল জলে ক্যানো বেজায় টলমল করছিল। জল গর্জন করে ছুটে আসছে তীরের দিকে। তাই সোজাসুজি এগোনো কঠিন। মাঝিরা তীর বরাবর আশ্চর্য কৌশলে এগোল। তারপর এখানে জলের মধ্যে বড়-বড় পাথর থাকায় ভেতরে জল অনেকটা মেজাজ বদলে ভালমানুষ হয়েছে। সেখানে পৌঁছে জ্যোৎস্না পলিনেশীয় ভাষায় মাঝিদের কিছু বলল। তার মধ্যে শুধু 'ওয়েইকাপালি' কথাটা বুঝতে পারলাম।

জলের ঝাপটায় ততক্ষণে আমরা সবাই ভিজে গেছি। ক্রমাগত ভিজছি। ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। বললাম, জ্যোৎস্না ওয়েইকাপালি গুহার কথা বললে নাকি ওদের ?

জ্যোৎস্না হাসল। হ্যাঁ, জয়ন্তদা। ওই যে পূবের দেয়ালমতো জায়গা দেখছেন, ওখানেই ওয়েইকাপালির গুহা। বললাম ওদের

রাজা হোলাহুয়ার পুজো দিতে যাচ্ছি। ওরা তাই খুব খুশি। তবে বাড়তি দু ডলার লাগবে।

বব বলল, দেব।

অনেক পাথরের গলিঘুঁজির ভেতর দিয়ে এগিয়ে এক সময় মাঝিরা আমাদের আরেকটা ছোট্ট চাতালমতো জায়গার সামনে পৌঁছে দিল। একে-একে আমরা উঠে গেলাম। মাঝিরা ক্যানোতে অপেক্ষা করতে থাকল।

বললাম, জ্যোৎস্না, তুমি কি আগে এ গুহায় এসেছ কখনও?

জ্যোৎস্না বলল, আমাদের রেস্তোরাঁর পরিচারক জুহুর সঙ্গে একবার এসেছিলাম। জুহু এখানে মানত করতে এসেছিল। তবে ভেতরে বেশীদূরে ঢুকিনি। ভীষণ অন্ধকার। তাছাড়া একগাদা মড়ার খুলি আর হাড়গোড় পড়ে থাকতে দেখেছি।

বব মুচকি হেসে বলল, তাহলে নিশ্চয় ভূত আছে ভেতরে।

আমার শার্টের পকেটে ভাগ্যিস জনখুড়োর সেই অনুবাদের কাগজটা রয়ে গেছে। বললাম, জ্যোৎস্না। এসেই পড়লাম যখন, তখন 'দক্ষিণ সাত গজ পূর্ব দুফুট বাঁদিকে কবচ' ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে চাই। কাগজটা আমার সঙ্গেই আছে।

জ্যোৎস্না চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলল, কিন্তু যদি মিনিহুনের পাল্লায় পড়ি।

বব আস্তিন গুটিয়ে বলল, আমি ক্যারেটের প্যাঁচ জানি। ভেবো না।

প্রচণ্ড হাওয়ার ঝাপটানিতে এবং রোদ্দুরে আমাদের পোশাক একটুতেই শুকিয়ে গেছে। এখন হাওয়াটা তত ঠাণ্ডা না, এই রক্ষে। জ্যোৎস্না চাতাল থেকে পা বাড়িয়ে বলল, সাবধানে আসুন।

অজস্র ছোটবড় পাথর পড়ে আছে, কিছুটা ঢালু খাড়া দেওয়ালের মতো জায়গায়। পাথরগুলো কোন যুগে ওপর থেকে ভেঙে গড়িয়ে

এসে খাড়ির গায়ে আটকে রয়েছে। তার ভেতর সাবধানে প্রায় তিনশ ফুট ওঠার পর একটা ফাটল দেখতে পেলাম। ফাটলটা চওড়াতে একগজ, লম্বায় দুগজ। জ্যোৎস্না বলল, এই হচ্ছে ওয়েই-কাপালি গুহার মুখ। ভেতরে কিন্তু হলঘরের মত চওড়া।

বব বলল, আহা! বুদ্ধি করে একটা টর্চ আনলে কত ভাল হত।

জ্যোৎস্না পকেট থেকে একটা খুদে টর্চ বের করে বলল, সে কি আনিনি? আমি আপনাদের নিয়ে এখানে আসব বলেই বেরিয়েছিলাম।

দুষ্টু মেয়ে। তোমার মতলবের কথাটা আগে বললে তৈরি হয়েই আসতাম।

আমার কথা শুনে বব বলল, বেশি তৈরি হওয়া ঠিক না আমি বরাবর দেখেছি, তৈরি হয়ে কিছু করতে গেলে ফল হয় না। চলো, ঢুকে পড়া যাক্।

বললাম, একমিনিট। জ্যোৎস্না, এটা ওয়েইকাপালি। কিন্তু ওয়েইকানালোয়া গুহাটা কোথায়?

জ্যোৎস্না বলল, সেটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। বাঁদিকে একটু ওপরে। সেখানে কেউ যায় না। যাওয়াও খুব কষ্টসাধ্য। তবে আমাদের পরিচারক জুহুর কাছ থেকে শুনেছি, দুটো গুহার মধ্যে যোগাযোগ আছে। কোথায় নাকি একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে।

গুহার ফাটল দিয়ে আগে ঢুকল জ্যোৎস্না—কারণ সে আগে একবার এসেছে। তার পেছনে বব। শেষে আমি। ঢুকতেই একটা বিটকেল গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠল। নাকে রুমাল চাপা দিলাম তিনজনেই।

ভেতরটা সত্যি প্রকাণ্ড হলঘরের মতো। বাইরের আলোর ছটায় সামান্য কয়েক গজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তার ওধারে ঘন কালো আঁধার। জ্যোৎস্নার খুদে টর্চের আলো কিন্তু দারুণ

জোরালো। ইলেকট্রনিক বাতি আসলে। সেই আলোয় যা দেখলাম, ভীষণ চমকে উঠলাম।

দুধারে জড়ো করা আছে অসংখ্য মানুষের মাথার খুলি আর হাড়গোড়। এই রহস্যময় গুহার ভেতর যেন রাক্ষস-খোক্কসের বাস। মানুষ ধরে খেয়েছে এখানে। গা ছমছম করতে থাকল। বব একটা খুলি তুলে নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে থাকল, হাই ম্যান! হাউ আর ইউ?

হঠাৎ জ্যোৎস্না বলল, চুপ! কী একটা শব্দ পাচ্ছি যেন।

সে আলো নেভাল। অন্ধকারে দূরে কারা চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে যেন। কারা ওরা?

বব ফিসফিস করে বলল, জ্যোৎস্না টর্চ দাও। আমি একটু এগিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কী?

জ্যোৎস্না টর্চ দিয়ে বলল, বেশি দূরে যেও না। আর সাবধান, দরকার না হলে টর্চ জ্বেলো না।

বব অন্ধকারে এগিয়ে গেল। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। নাকে রুমাল চেপেই রেখেছি—সরালে দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উগরে আসছে।

ববের ফেরার নাম নেই। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছি ক্রমশ। সেই কথাবার্তার আওয়াজ কিন্তু সমানে শোনা যাচ্ছে।

কতক্ষণ পরে বব অন্ধকার থেকে ছিটকে এসে পড়ল। ব্যস্তভাবে বলল, কোকো পাম হোটেলের বেলক্যাপ্টেন সেই টিহোব্যাটাকে দেখলাম মনে হল। তার সঙ্গে জনাতিনেক লোক আছে। গুহার ভেতরটা বাঁদিকে ঘুরে গেছে, তাই ওদের আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাছাড়া বাঁকের মুখে প্রকাণ্ড বেদীতে একটা মূর্তি আছে। ওরা মূর্তির পেছনে গজ-ফিতে দিয়ে মেঝেয় মাপছে। কিন্তু তার চেয়ে অবাক কাণ্ড, টিহোর কাঁধে সম্ভবত একটা মিনিহুন বসে আছে দেখলাম। কালো কুচকুচে বাঁদরের মতো। দেখবে এস।

অন্ধকারে ববের পেছনে দেয়াল ধরে-ধরে আমরা এগোলাম। অনেকটা এগিয়ে বব ফিসফিস করে বলল, এবার বাঁদিকে।

বাঁদিকে ঘুরতেই প্রথমে চোখে পড়ল দূরে আলোর ঝলক। একটা মার্কারি ল্যাম্প জ্বলছে। ছায়ার মতো কয়েকটা লোক কীসব করছে-টরছে। সামনের বেদীর ওপর একটা বিশাল মূর্তি। তার পাশ দিয়ে গেছে করিডোরের মতো গুহা-পথ। আমরা বেদীর পেছনে গিয়ে উঁকি মেরে ওদের ব্যাপার-স্যাপার দেখতে থাকলাম।

হোয়া-হোয়া-হোয়া আ-আ!

ওরা চারজনে ফিতে ধরে একবার মেঝে, একবার দেয়ালের এপাশ-ওপাশ মাপামাপি করছে আর চাপা গলায় কী সব কথাবার্তা বলছে। জ্যোৎস্নার পক্ষে বোঝা সম্ভব। কিন্তু আমাদের মুখ খোলা বিপজ্জনক। ওরা টের পেয়ে যাবে।

একটু পরে একজন বেঁটে মোটাসোটা লোক এদিকে ঘুরে মার্কারি বাতির কাছে এল। বাতিটা কিসের ওপর বসানো। নিশ্চয় ব্যাটারির বাক্সে। খুব যোগাড়যন্ত্র করে গুহায় ঢুকেছে তাহলে।

বব আমাকে খুঁচিয়ে দিল। বুঝলাম এই তাহলে রাজবংশীয় টিহো। গায়ের রঙটা ঘোর বাদামী। পেল্লায় গোঁফ মুখে। নাকটা প্রকাণ্ড এবং একটু থ্যাবড়া। মাথায় কাঁচাপাকা ছোট চুল। কিন্তু গোঁফ একেবারে সাদা।

সে আলোর সামনে ঝুঁকে (ও হরি! এ যে আমার সেই সিগারেট কেস!) সিগারেট কেসের ভেতরটা পড়বার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বুদ্ধি আছে বটে। একটা আতস কাচও এনেছে। আতসকাচের সাহায্যে পড়ার চেষ্টা করছে।

রাগে আমার ভেতরটা গরগর করতে থাকল। আমার বাল্য-বন্ধুর উপহার দেওয়া ওই সিগারেটকেসটা আমার কতকালের সঙ্গী।

সবসময় ওটা ব্যবহার করতাম না। কদাচিৎ ইচ্ছে হলে তবে। এবার আমেরিকা বেড়াতে আসার সময় কী খেয়ালে ওটা সঙ্গে এনেছিলাম।

নাকি জনখুড়ো যা বলেছেন তাই ঠিক? নিয়তি আমাকে টেনে এনেছে এখানে। সিগারেটকেসটা যেখানকার জিনিস, সেখানে ফিরে আসতে চেয়েছিল যেন।

এইসব কথা ভেবে আমার কেমন একটা অস্বস্তি হতে থাকল। তাই ভাবলাম, চুলোয় যাক। সিগারেটকেস যার হাতে পৌঁছানোর কথা, পৌঁছে গেছে। তবে শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা দেখে যাওয়া যাক্। আমার এই বিদঘুটে স্বভাব—রহস্যভেদী এক বুড়ো ঘুঘুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে স্বভাবটা বাগে পেয়েছে, যেখানে রহস্যের গন্ধ পাই নাক গলাতে ইচ্ছে করে।

টিহো সিগারেট কেসের ভেতরটা আতস কাচের সাহায্যে ফের দেখে নিয়ে সঙ্গীদের কিছু বলল। তখনই চোখে পড়ল সেই আজব কদর্য প্রাণীটাকে।

প্রাণীটা ব্যাটারিবাকসেতে হেলান দিয়ে কলা খাচ্ছিল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর কলা ফলে। এই হাওয়াই দ্বীপে কাল লিহিউ বিমানঘাঁটি থেকে আসতে আসতে অজস্র কলাবাগান দেখেছি। একেকটা কলা প্রায় দেড় ফুট পর্যন্ত লম্বা এবং গাঢ় হলুদ রঙ। এসব কলা আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে প্রচুর বিক্রি হয়। কাজেই এর মধুর স্বাদের সঙ্গে আমার চেনাজানা হয়ে গেছে। বানর-জাতীয় জীবটি যদি সত্যি সেই মেনেহিউন বা মিনিহুন হয়, তাহলে বলতে হবে কলাই তার প্রধান খাদ্য। কারণ তার সামনে প্রায় এক কাঁদি কলা রয়েছে।

একটা লোক মার্কারি বাতি ও ব্যাটারি যন্ত্রটা তুলে কাঁধে নিল। তখন খুদে প্রাণীটা দুপায়ে উঠে দাঁড়াল। তার এক হাতে কলার কাঁদি। কালো হাতটার দাগড়া দাগড়া পেশীর ওপর আলো

ঠিকরোচ্ছে। তার মুখটা স্পষ্ট নজরে পড়ল। অবিকল মানুষের মতো। কিন্তু আকারে একটা বড় সাইজের মোসাম্বি লেবুর মতো গোলাকার। কান দুটো বেশ বড়। গায়ে একটুও লোম নেই। সব মিলিয়ে আস্ত একটি মানুষ-চামচিকে বলা যায়—শুধু ডানার বদলে দুটো হাত আছে।

ওরা এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে একটা ফাটলে ঢুকে গেল। ক্রমশ আলোর ছটাও মিলিয়ে গেল। আবার গাঢ় অন্ধকারে ভরে গেল ওয়েইকাপালি গুহা। জ্যোৎস্না ফিসফিস করে বলল, ওরা সঠিক জায়গাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওয়েইকানালেয়া গুহার যে সুড়ঙ্গপথ এগুহায় এসেছে সেটাই খুঁজতে গেল ওরা। শুনেছি দুই গুহার মধ্যেকার এ সুড়ঙ্গপথ আজ পর্যন্ত কেউ খুঁজে পায়নি।

বব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো। ওদের পেছন পেছন যাই।

জ্যোৎস্না বলল, আমি একটা কথা ভাবছি। আমাদের বড্ড বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে না? মাঝিরা যদি রাগ করে ক্যানো নিয়ে চলে যায়, খুব বিপদে পড়ে যাব।

বব বলল, তাহলে তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। আমি ঝটপট ওদের বলে আসি, মানত দিতে আমাদের একটু দেরি হবে। প্রার্থনা করব কিনা? তিনজনের প্রার্থনা একটু লম্বা চওড়া হবেই।

জ্যোৎস্না বলল, তাই যাও বব। যদি আরও দুডলার বেশি চায় দেরি হবার জন্য। রাজি হয়ো।

বব গুহার মেঝেয় সাবধানে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে চলে গেল।

বললাম, জ্যোৎস্না! এই মূর্তিটা নিশ্চয় কোনো দেবতার?

জ্যোৎস্না বলল, হ্যাঁ। পলিনেশীয় জাতির আদিম যুগের এই দেবতার নাম কন-টিকি।

কন-টিকি? অবাক হয়ে বললাম। এ তো খুব চেনা শব্দ মনে

হচ্ছে! হ্যাঁ—বিখ্যাত অভিযাত্রী থর হেয়ারডাল কন-টিকি নামে একটা ভেলায় প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন।

জ্যোৎস্না বলল, কন-টিকি আসলে সূর্যদেবতা। আদিমযুগে প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপে এই সূর্যদেবতার পুজো হত। এখন পলিনেশীয়রা প্রায় সবাই খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। তাই আর কন-টিকির পুজো হয় না। হায়েনায় এসে শুনেছি, পলিনেশীয়রা এখনও কেউ কেউ কন-টিকির পুজো করে। তবে এ পুজো মানে নেহাত রোগ বা বিপদ আপদে মানত করা। তাও ওরা লুকিয়ে চুরিয়ে মানত করতে আসে। পাদ্রীরা জানতে পারলে জরিমানা করে যে! কিন্তু জানেন জয়ন্তদা বিদেশীরা মানত দিতে এলে পলিনেশীয়রা ভারি খুশি হয়। তবে ভয়ে কেউ এতদূর আসতে পারে না। গুহার দরজার মুখে কিছু ফুল রেখে চলে যায়। কারণ নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—ওই সব মড়ার মাথার খুলি হাড় কংকাল! ভূতের ভয়ে এদিকটায় ক্যানো নিয়ে আসতে চায় না। নেহাত টাকার লোভে কেউ আসে।

তুমিও তাহলে এই মূর্তিটার কাছে আস নি?

মোটেও না। এতদূর আসব, কী দরজার মুখেই যা বিচ্ছিরি গন্ধ।

আমরা ফিসফিস করে কথা বলছিলাম। ইচ্ছে হল, বেদীতে উঠে মূর্তিটাকে ছুঁয়ে দেখি কী দিয়ে তৈরি। তাই বললাম, জ্যোৎস্না! আমি বেদীতে উঠে মূর্তিটা ছুঁয়ে দেখি। ইচ্ছে করলে তুমিও উঠতে পারো। উঠবে নাকি?

জ্যোৎস্নার কোনো সাড়া পেলাম না। তাই ফের ডাকলাম জ্যোৎস্না! আসবে নাকি?

তবু কোনো সাড়া নেই। একটু জোরে ডাকলাম, জ্যোৎস্না গেলে কোথায়?

আশ্চর্য জ্যোৎস্না কি অন্ধকারে তামাশা করছে আমার সঙ্গে? এ কি তামাশার সময়?

রাগ করে বললাম, জ্যোৎস্না! সাড়া দিচ্ছ না কেন?

মেয়েটা ডানপিটে এবং গায়ে জোর আছে। তাই বলে এ ভুতুড়ে গুহায় আমার সঙ্গে এমন ফাজলেমি করা কি উচিত হচ্ছে? আমি হাতবাড়িয়ে ওকে খুঁজলাম। পেলাম না। তখন বেদী থেকে অন্ধের মতো দুহাত বাড়িয়ে কানামাছি খেলতে থাকলাম অন্ধকারে। দেয়ালে ধাক্কা লাগতেই আরও চটে গিয়ে গলা চড়িয়ে বললাম, হচ্ছেটা কী? জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না?

ঠিক সেই সময় অন্ধকারে দূরে আচমকা বীভৎস একটা চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। হোয়া হোয়া—আ—আ? হোয়া হোয়া হোয়া—আ—আ। হোয়া হোয়া হোয়া—আ—আ!

অনেকগুলো রাক্ষুসে মানুষের চিৎকার যেন। বিদেশী ফিলমে জংলীদের চিৎকারের মতো। হোয়া হোয়া হোয়া—আ—আ! হোয়া হোয়া হোয়া—আ—আ।

অমানুষিক চিৎকার করতে করতে কারা এগিয়ে আসছে এদিকে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলাম না। অন্ধকারে অন্ধের মতো দৌড়তে চেষ্টা করলাম। কোনদিকে দরজা—কোনপথে এসেছি, তা ঠিক করতে পারলাম না। বার বার আছাড় খেলাম। জান্তব চিৎকারটা খুব কাছে বলে মনে হল। তারপর যেই পা ফেলেছি, হড়াৎ করে একটা গর্তে পড়ে গেলাম।

পড়লাম একেবারে কনকনে ঠাণ্ডা জলে। জলে পড়ায় আঘাত লাগল না। কিন্তু কী তীব্র স্রোত! আমাকে টেনে নিয়ে চলল খড়ের কুটোর মতো।

কতক্ষণ অসহায় ভেসে থাকার পর একখানে স্রোতটা হঠাৎ কমে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার তো! তারপর জলটা আমাকে উল্টোদিকে ঠেলতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম সমুদ্রের জল গুহার তলার সুড়ঙ্গে একবার করে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে আসছে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। তাই এরকম দুমুখো টান জলে।

হাত বাড়িয়ে শক্ত কিছু খুঁজলাম। হাতে দেয়াল ঠেকল। কিন্তু জলের ধাক্কায় মসৃণ দেয়াল ধরার উপায় নেই। আবার এক হ্যাঁচকা টানে স্রোতের মুখে ভাসলাম। হাত দুটো অসহায়ভাবে ওপরে বাড়াতেই ছাদে ঠেকল। তারপর ছাদটা ঢালু হয়ে জলে ডুবেছে টের পেলাম। সর্বনাশ! এবার জলের তলায় দম আটকে মারা পড়তে হবে যে! কিন্তু না ডুবে উপায় নেই। মাথা ভেঙে যাবে।

প্রচণ্ড বেগে জল আমাকে টেনে নিয়ে চলল। দম বন্ধ হয়ে আসছে। আঃ বাতাস! মাথা তোলার জন্য একটুখানি আকাশ!

বুক ফেটে যাবে বুঝি। জলের টান যেন গভীর পাতালে নিয়ে চলেছে। একসময় আর সহ্য করতে পারলাম না। নিঃশ্বাস নেবার জন্য ঠেলে মাথা তুললাম। মাথায় কিন্তু ছাদের ধাক্কা লাগল না। আঃ। আবার একটুকরো আকাশ পেয়েছি। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে থাকলাম। এখানে স্রোতটা কমেছে। জলটা ঘুরপাক খাচ্ছে। বাঁদিকে একটু সরলে আবার তীব্র স্রোত পেলাম। তারপর সমানেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রমশ।

একটা ফাটল দিয়ে রোদ্দুর ঢুকেছে। বরফগলা জলে শরীর নিঃসাড়। কিন্তু রোদ্দুর দেখে বাঁচার তাগিদ জোরালো হয়ে উঠেছে। ফাটলের কাছে পৌঁছতেই আঁকড়ে ধরলাম একটা পাথরের খাঁজ। ফাটলটা প্রায় হাত দেড়েক চওড়া। অনেক কষ্টে সেখান দিয়ে ওপরে উঠতে থাকলাম।...

অগ্নিদেবী পিলির ভক্তবৃন্দ

চারদিক খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পেরেছি আমার অবস্থা হয়েছে রবিনসন ক্রুশোর মতো। যেখানে বসে আছি, তার নিচে হ্রদ। হ্রদের একটা দিক সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত। বাকি তিনদিকে পাহাড়। খাড়া দেওয়ালের মতো পাহাড়। হ্রদের জলে হাজার-হাজার পাখি

ভেসে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রের সঙ্গে একটা চওড়া নালা দিয়ে হ্রদের যোগাযোগ রয়েছে। সেখানে জলটা প্রচণ্ড ফুঁসছে। কিন্তু হ্রদের ভেতর তত ঢেউ নেই। মাঝেমাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আসছে। জলে বসছে। আবার তুমুল চেঁচামেচি করতে করতে উড়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট চাতালে বসে থাকতে থাকতে আমার ভিজে পোশাক শুকিয়ে গেছে। এখন বেলা প্রায় বারোটা বাজে। হ্রদের ওপর দিয়ে একটু আগে একটা হেলিকপটার উড়ে গেছে। আমি চিৎকার করেছিলাম—কিন্তু ওরা লক্ষ্য করেনি। খুব দমে গেছি। আমার ওপর দিকে পাহাড় এত খাড়া, ওদিক দিয়ে ওঠা অসম্ভব। অথচ একটা কিছু করতেই হবে।

বসে থাকতে থাকতে চোখে পড়ল, চাতালটার নিচে যে ফাটল দিয়ে আমি উঠেছি, তার ভেতর একস্থানে একটা প্রকাণ্ড গর্ত রয়েছে। গর্তটা কালো দেখাচ্ছে। ওর ভেতর ঢুকলে আবার সুড়ঙ্গ নদীতে পড়ব কিনা কে জানে! তবুও চেষ্টা করা যেতে পারে।

সাবধানে নেমে গর্তটার কাছে গেলাম। পা রাখার জায়গা গর্তের বাইরে কোথাও নেই। তাই পাথরের খাঁজ আঁকড়ে ধরে গর্তের ভেতর ঢুকে পড়লাম। এতক্ষণে মনে পড়ল আমার পকেটে একটা গ্যাস লাইটার আছে। গর্তটা প্রায় একগজ চওড়া, গজ দুই উঁচু। দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে। লাইটার জেলে যেটুকু দেখতে পেলাম তাতে প্রমাণ পাওয়া গেল একসময় এখানে মানুষ এসেছিল। কারণ এক কুচি কাগজ আর কয়েকটা পোড়া সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। (আশায় নেচে উঠলাম। মানুষ এখানে যদি এসে থাকতে পারে, যাওয়ার পথও নিশ্চয় আছে)।

লাইটার নিবিয়ে যা থাকে বরাতে ভেবে সাবধানে এগিয়ে গেলাম। কিছুটা যাওয়ার পর ফের লাইটার জ্বালি আর দেখে নিই। আবার কিছুটা এগিয়ে যাই। এমনি করে অনেকটা গিয়ে টের পেলাম এটাও একটা গুহা। ক্রমশ ভেতরটা হলঘরের মতো চওড়া

হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওয়েইকাপালির মতো কোনো দুর্গন্ধ টের পাচ্ছি না। বরং কী একটা মিঠে গন্ধ মাঝে মাঝে আবছাভাবে নাকে ভেসে আসছে। গন্ধটা কিসের হতে পারে? এমন মিঠে গন্ধ আমার অচেনা।

তাহলে কি এটাই হায়েনার তিননম্বর গুহা 'মানিনিহোলা?' এই গুহাটার কথা জনখুড়োর কাছে শুনেছিলাম। এটার নাম 'শুকনো গুহা।' কারণ কী? তলায় সুড়ঙ্গনদী নেই বলে? জন-খুড়ো বলতে পারেনি। শুধু বলেছিলেন, পলিনেশীয় ভাষায় একে বলা হয় শুকনো গুহা।

যে জন্যেই শুকনো গুহা বলা হোক, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মেজাজ নেই। আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে, এটাই আসল কথা। নইলে রবিনসন ক্রুশোর মতো জীবন কাটাতে হবে।

লাইটারের গ্যাস ফুরিয়ে আসছে। তাই অন্ধকারে দেয়াল ছুঁয়ে হাঁটছিলাম। একখানে দেয়ালটা বাঁদিকে বেঁকে গেছে। সেখানে বাধ্য হয়ে লাইটার জাললাম। চোখে পড়ল, ওয়েইকাপালির মতো এখানেও উঁচু বেদীর ওপর একটা মূর্তি রয়েছে। বেদীর ওপর মূর্তির পায়ের কাছে একগাদা শুকনো ফুল। আবার লাইটার জেলে মূর্তিটা দেখতে গিয়ে অবাক হলাম। এটা 'কন-টিকির' মতো কালো নয়, হলুদ রঙের পাথরে তৈরি। তাছাড়া এটা দেবীমূর্তি। কিন্তু কী হিংস্র চেহারা! লাইটারের গ্যাস হঠাৎ এসময়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

আবার দেয়ালে দিকে পা বাড়িয়েছি, অমনি অন্ধকারে ঠাণ্ডা কিছু আমার কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মুখ চেপে ধরল। ঠাণ্ডা হিম দুটো ছোট্ট হাত। চেঁচিয়ে ওঠারও সুযোগ পেলাম না।

কিন্তু তক্ষুনি টের পেলাম, মিনিহুনের খপ্পরে পড়েছি। ওয়েই-কাপালিতে জ্যোৎস্নাও তাহলে ঠিক এইভাবে ব্যাটাচ্ছেলের পাল্লায় পড়েছিল।

একটা দুটো নয়, মনে হচ্ছিল একপাল মিনিহুন আমার ওপর নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং আমাকে তারা চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল অন্ধকারে। আমার কাঁধের মিনিহুন মুখটা শক্ত করে ধরে রইল। মনে হল, বাধা দিলে ওরা আমার হাড়গুঁড়ো করে ফেলবে।

কিন্তু আশ্চর্য, নাকটা খোলা থাকায় সেই মিঠে গন্ধটা ক্রমশ তীব্র হয়ে ভেসে আসছিল। এত তীব্র যে গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করতে থাকল। তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।...

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখলাম একটা চারকোনা ঘরের মেঝেয় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছি। আমার হাতপা বাঁধা হয়নি। কিন্তু গায়ে এতটুকু জোর নেই যে উঠে দাঁড়াই। ঘরের দেয়ালে অসংখ্য দেবীমূর্তির চুলগুলো সাপের মতো ফণাতোলা এবং দুচোখে রাগ ঠিকরে পড়ছে। সামনে একটা সোনালী রঙের সিংহাসন। সিংহাসনে কেউ নেই। সিংহাসনের মাথার ওপর রাজছত্র থেকে হলুদ রঙের আলো ছড়াচ্ছে। ঘরের ভেতর একেবারে ফাঁকা। বিদঘুটে প্রাণীগুলো গেল কোথায়?

অতিকষ্টে দেওয়ালে ভর করে উঠে দাঁড়ালাম। মেঝেয় কোন কালের পুরনো কার্পেট পাতা রয়েছে। ছাদেও সেই রকম দেবী-মূর্তি আঁকা। চারদিক থেকে হিংস্রদৃষ্টিতে মূর্তিটা আমাকে যেন গিলে ফেলতে চাইছে।

সিংহাসনের ওপর রাজছত্রের আলোটা স্থির। কাছে গিয়ে মনে হল, ওটা সাধারণ কোনো আলো নয়। সম্ভবত কোনোরকম রত্নপাথর। তা থেকে আলো ছড়াচ্ছে।

ঘরের দেয়াল একেবারে নিরেট। কোথাও দরজার চিহ্নটি নেই। ভারি অদ্ভুত তো!

চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে নিচ্ছি, হঠাৎ সিংহাসনের পেছনের দেয়ালের একটা অংশ ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর আঁতকে উঠে

দেখলাম, দুটো কালো কদর্য বাঁদরজাতীয় খুদে মানুষ—হ্যাঁ সেই মিনিহুন ওরা—ঘরে ঢুকল। তাদের দুজনের হাতে দুকাঁদি কলা।

আমি পিছিয়ে এসে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছি। ওরা কলার কাঁদি দুটো আমার সামনে রেখে একসঙ্গে কালোমুখের সাদা দাঁত বের করে বলল, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ উঁয়া উঁয়া।

অবিকল এইসব শব্দ। নিশ্চয় এটাই ওদের ভাষা। আমাকে কি অতগুলো কলা খেতে বলছে ব্যাটাচ্ছেলেরা ? ওই কলা একটা খেলেই আমার পেট পিপের মতো ফুলে উঠবে যে।

ভয়ে ভয়ে হুকুম মেনে একটা কলা ভেঙে নিলাম। খিদেও প্রচণ্ডরকম। কলাটা খুব সুস্বাদু, স্বীকার না করলে পাপ হবে। দুই মিনিহুন গম্ভীর মুখে আমার খাওয়া দেখলে কিছুক্ষণ। তারপর সেইরকম বিদঘুটে হুঁহুঁ করে চলে গেল। দরজাটা আবার দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল।

তাহলে এদের যতটা খারাপ ভেবেছিলাম, ততটা মোটেও নয়। বরং ভদ্র বলেই মনে হচ্ছে। আমি ক্ষুধার্ত টের পেয়ে খাদ্য দিয়ে গেল যখন।

কিন্তু জলতেষ্টা পেয়েছে যে। এবার যদি এককাঁদি ডাব দিয়ে যেত, কী সুখের না হত। এসব দ্বীপে নারকেল গাছের জঙ্গল হয়ে আছে। লোকের বাগান থেকে এ ব্যাটারা নিশ্চয় কলাগুলো চুরি করে আনে। ডাব পেড়ে আনে না কেন ?

কী কাণ্ড। ওরা কি মনের কথা টের পায় ? দরজাটা খুলে গেল। তারপর সত্যিসত্যি দুটো মিনিহুন। (এরা নিশ্চয় আগের দুজনই) এক কাঁদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাব এনে বলল হুঁ হুঁ হুঁ, হিঁ হিঁ হিঁ উঁয়া উঁয়া।

মুখে মিঠে হাসি রেখে বললাম, খেতে তো বলছ। কিন্তু ডাব কাটার অস্তর চাই যে। ছুরিটুরি নেই তোমাদের।

ইশারায় ব্যাপারটা বুঝিয়েও দিলাম। ওরা মুখতাকাতাকি করল তারপর দুজনে একটা করে ডাব পটাপট ছেঁড়ে আর বোঁটার দিকটা হ্যাঁচকা টানে ওপড়ায়। জল ছলকে পড়ে। কী দারুণ জোর ওদের গায়ে!

প্রাণভরে ডাবের জল খেলাম—পর পর তিনটে। পেট ফুলে ঢোল হল। হাত নেড়ে বললাম থাক্ থাক্। এই যথেষ্ট হয়েছে বন্ধুরা।

ওরা এবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ভুতুড়ে হেসে উঠল, হিঁ হিঁ হিঁ। পিলে চমকানো হাসিরে বাবা। বললাম, থাক্। থাক্। আর হাসে না।

ওরা পিটপিটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম, হ্যাঁ—অসংখ্য ধন্যবাদ আমার খুদে বন্ধুরা। এবার দয়া করে আমাকে বাইরে পৌঁছে দাও দিকি।

কে জানে কেন, ওরা আমাকে জিভ ভ্যাংচাতে শুরু করল। দেখেতো বেজায় ভড়কে গেলাম। কাঁচুমাচু মুখ করে বললাম আচ্ছা আচ্ছা। আর বেরুবার নাম করব না। দোহাই বাবা, আর অমন বিচ্ছিরি ভেংচি কাটে না।

ওরা এবার আমাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে শুরু করল। আমেরিকায় বুড়ো আঙুল দেখানোর খুব আনন্দের এবং বন্ধুতার ব্যাপার। আমি ওদের বুড়ো আঙুল দেখাতে থাকলাম। তখন ওরা সাদা দাঁত বের করে ফের হেসে উঠল, হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ।

এক সময় দরজা খুলে গেল এবং তুম্বো চেহারার এক মিনিহুন ঢুকে হুঁ হুঁ করে কিছু বলল। তখন আমার খুদে বন্ধুদ্বয় আমার দুহাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

করিডোরে সুন্দর একফালি পথ। সেইরকম আলো জ্বলছে। তলায় তেমনি কার্পেট বিছানো রয়েছে। কিছুদূর চলার পর সামনের দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে দেখি, প্রকাণ্ড হলঘরের

মধ্যে প্রায় শখানেক মিনিহুন গম্ভীরমুখে বসে রয়েছে। উঁচু বেদীর ওপর যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে দেখে চমকে উঠলাম।

অবিকল সেই দেবীমূর্তির মতো চেহারাও। গায়ের রঙ উজ্জ্বল সোনালী। কোঁকড়ানো লাল একরাশ চুল মাথায়। পরনে ঝলমলে হলুদ রঙের আলখেল্লার মতো পোশাক।

আমাকে বেদীর সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে মিনিহুনদ্বয় সরে গিয়ে ভিড়ে বসে পড়ল। বেদীর মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বুঝতে পারলাম, স্বর্গের কোনো দেবী-টেবী নন মোটেও মেমসাহেব না হয়ে যান না।

আমার অনুমান সত্যি হল তক্ষুনি। মহিলাটি আমেরিকান উচ্চারণের ইংরাজিতে বলে উঠলেন, আই অ্যাম দা ফায়ার-গডেস পিলি। আমি অগ্নিদেবী পিলি। সারা প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশীয় দ্বীপগুলোতে এক সময় আমার স্বামী সূর্যদেব কনটিকি এবং আমার পুজো হত। বর্বর ইউরোপীয় জাতির লোক আমাদের পুজো বন্ধ করে দিয়েছে। তাই ওদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। আমার হিংস্র হায়েনার দল ওদের সামনে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। টুকরো-টুকরো করে খেয়ে ফেলে। ওয়েইকাপালির দরজায় খুলি এবং হাড়ের পাহাড় গড়ে তুলেছি। দেখে যেন ওদের শিক্ষা হয়॥

আঁতকে উঠে বলে ফেললাম, মাননীয় মহোদয়া! আমি মোটেও ইওরোপীয় নই। আমি একজন ভারতীয়। আমার চেহারা আর গায়ের রঙ দেখুন।

কথাগুলো 'অগ্নিদেবী' কানে নিলেন বলে মনে হল না। হেসে উঠলেন। বড় হিংস্র হাসি। আর তাঁর কালো কুচকুচে খুদে ভক্তবৃন্দও একসঙ্গে বিকট ভুতুড়ে হাসি হাসতে লাগল—হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ.........

কিন্তু ততক্ষণে আমার মাথায় অনেক প্রশ্ন জেগেছে। কে এই 'অগ্নিদেবী পিলি'? বুঝতে পারছি, ইনি একজন মেমসায়েব তো বটেই, এবং আমেরিকান। কারণ মারকিন মহিলাদের মতো নাকিস্বুরে ইংরেজি উচ্চারণ করছেন। তাছাড়া ওই ইংরেজিও আমেরিকান ইংরেজি। প্রায় মাসচারেক আমেরিকায় থেকে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, ব্রিটেন কানাডা আর আমেরিকা তিনটি দেশেই ইংরেজি ভাষায় লোকেরা কথা বললেও বেশ খানিকটা তফাত আছে। ভাষার উচ্চারণ বাচনভঙ্গিতে অনেক অমিল।

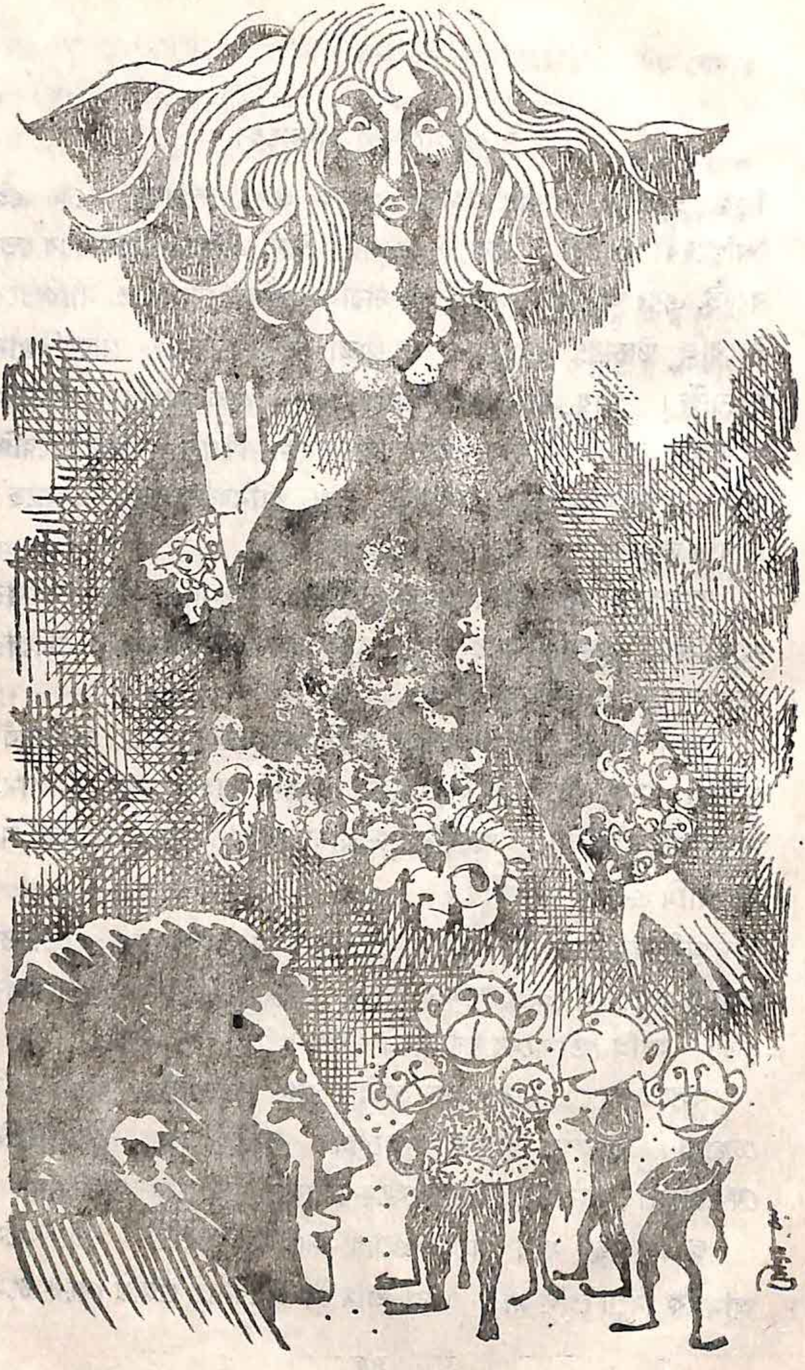
তারপরের প্রশ্ন, জ্যোৎস্নাকেও নিশ্চয় মিনিহুনরা তখন আমার মতো করে পাকড়াও করেছিল। তাকে কোথায় রেখেছে? আমাদের ধরে আনার উদ্দেশ্যই বা কী?

অপোগণ্ড জীবগুলোর ভুতুড়ে হাসি থামতেই চায় না। অগ্নিদেবী চেঁচিয়ে ধমক দিলে তবে থামল। তখন সাহস করে বললাম, মাননীয়া অগ্নিদেবী! আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না যে আমি একজন ভারতীয়?

অগ্নিদেবী গর্জে উঠলেন, ভারতীয় হও আর যেই হও,—তোমরা সভ্য দুনিয়ার লোকেরা আমার শত্রু। তোমরা বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর ধূর্ত। আমি তোমাদের ঘৃণা করি··ঘৃণা করি···ঘৃণা করি।

বলতে বলতে আরও অস্বাভাবিক এবং হিংস্র হয়ে উঠল ওঁর চেহারা। তারপর দুলতে থাকলেন। দুলতে দুলতে চোখ বুজে ফেললেন। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

ছত্রিশ বছর ধরে আমি ওদের অপেক্ষা করছি। ওরা এসে আমাকে নিয়ে গেল না। ওরা আমাকে হায়েনার গুহায় রেখে চলে



গেল। বলে গেল, ফিরে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। ওরা বিশ্বাসঘাতক। ওরা···

কথাগুলো শুনতে-শুনতে চমকে উঠেছিলাম। তারপর হঠাৎ কোথা থেকে ভরাট গম্ভীর গলায় ইংরাজিতে কে বলে উঠল, মারিয়া! মারিয়া! তুমি কি চুপ করবে? চুপ না করলে তিন নম্বর শাস্তি তোমার পাওনা হবে। সাবধান!

'অগ্নিদেবী'র নাম তাহলে মারিয়া? নামটা কেমন যেন চেনা লাগছে। মারিয়া চুপ করেছেন। চোখ খুলে তেমনি হিংস্র চোখে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ—আমি চুপ করেছি ফাদার গ্রিনকট।

অদৃশ্য ফাদার গ্রিনকটের আওয়াজ এল, যাও! এবার তোমার কর্তব্য পালন করো।

মারিয়া আমার দিকে হিংস্রমূর্তিতে তাকিয়ে রইলেন।

মারিয়া! ছুরি আর সাঁড়াশি কোথায় তোমার?

আমার হাতেই রয়েছে ফাদার গ্রিনকট।

আতঙ্কে কাঠ হয়ে দেখলাম, মারিয়ার একহাতে ছুরি অন্যহাতে একটা সাঁড়াশি।

ফাদার গ্রিনকটের কণ্ঠস্বর ভেসে এল আবার, ইয়াকে বলো রেকাব নিয়ে ওই বাদামী ভূতটার কাছাকাছি দাঁড়াক। আর উয়াকে বলো ওর সঙ্গীদের নিয়ে বাদামী ভূতটাকে শক্ত করে ধরে থাক। আর মারিয়া! তুমি ওর বুকটা চিরে হৃৎপিণ্ডটা সাঁড়াশি দিয়ে উপড়ে নাও। রেকাবে রেখে আমার কাছে নিয়ে এস। ওর ধড়টা আপাতত ওখানে পড়ে থাক পরে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এ কি দুঃস্বপ্ন—না সত্যি সত্যি ঘটছে? ওই ছুরি দিয়ে আমার বুক চিরে সাঁড়াশি দিয়ে আমার কলজে তুলে নেবে ভাবতেই মাথা ঘুরে উঠল। চিৎকার করতে চাইলাম। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। মারিয়া এবার হি হি করে হেসে উঠলেন। বেদী থেকে নেমে এলেন একহাতে চকচকে

ছোরা আর অন্যহাতে কালো সাঁড়াশি নিয়ে। তারপর দেখি, একটা মিনিহুন প্রকাণ্ড একটা রুপোলী রঙের রেকাব নিয়ে এগিয়ে এল। এদিকে একদল মিনিহুন আমাকে পেছনে ধরে ফেলে আমার বুকটা চিতিয়ে রাখল। জীবনে ভুলেও ঈশ্বরের নাম-টাম করিনি। বিশ্বাসও নেই। কিন্তু এখন যখন মরতে যাচ্ছি, বিশেষ করে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদয়ক হবে মৃত্যুটা—তখন ঈশ্বরের নাম গলার ভেতর থেকে বেরুতে চাইল কই? বোবা হয়ে গেছি যেন।

মারিয়া ছোরাটা আমার বুকের কাছে এসে ঝুঁকে দাঁড়াতেই চোখ বুজে ফেললাম। তারপর প্রতীক্ষা করতে থাকলাম, এই এবার তীক্ষ্ণধার ছোরা বুকে ঢুকে যাবে—এক সেকেণ্ড দু-সেকেণ্ড তিন সেকেণ্ড···

হঠাৎ কানে এল মারিয়া ফিসফিস কিছু বলছেন। ··ভয় পেয়ো না। আমি তোমার শত্রু নই। আমিও তোমার মতো এক বন্দী। তোমার বুকে খানিকটা লাল রঙ মাখিয়ে দিচ্ছি। আর একটুকরো স্পঞ্জ আছে আমার কাছে। সেটাতে লালরঙ ভরা রয়েছে। ওটা রেকাবে করে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর শোনো··

ফাদার গ্রিনকটের আওয়াজ এল, মারিয়া! দেরি হচ্ছে কেন?

মারিয়া বললেন, মন্ত্র পড়ছি ফাদার গ্রিনকট। বাধা দিলেন বলে আবার মন্ত্রটা গোড়া থেকে পড়তে হবে।

শয়তান ফাদার গ্রিনকট অদৃশ্য থেকে বলল, হুঁ। ঝটপট মন্ত্রটা আওড়ে নাও। আমার মেশিন গরম হয়ে যাচ্ছে। বেশি গরম হয়ে গেলে মেয়েটার মতো বাদামী ভূতটার কলজেও পড়ে যাবে। কাজে লাগানো যাবে না।

মারিয়া ফিসফিস করে বলল, শোনো। আমরা চলে গেলে তুমি মড়ার মতো পড়ে থেকো। সাবধান, একটুও নড়ো না। তারপর এরা তোমাকে হায়েনার ঘরে ফেলে দিয়ে আসবে। ভয় নেই—হায়েনা-

গুলোকে আমি ঘুমের ওষুধ মেশানো মাংস খাইয়ে রেখে এসেছি। ওরা ঘুমোচ্ছে। তুমি ওঘরে চুপচাপ পড়ে থেকো। তারপর আমি সময় মতো যাব'খন।

মারিয়া ছোরা আর লালরঙ ভরা স্পঞ্জটা বুকে ঠেকিয়ে বলল, সত্যি সত্যি বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বের করলে মানুষ ফের যেমন আর্তনাদ করে, তেমনি আর্তনাদ করো। সাবধান, শয়তানটা যেন টের না পায় যে তুমি অভিনয় করছ। এর ওপর তোমার বাঁচামরা নির্ভর করছে।

আমি একসময় থিয়েটার করতাম। মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্তনাদের অভিনয় একবারই করেছিলাম। এখন প্রাণের দায়ে সেইরকম রাম চ্যাচানি চেঁচিয়ে উঠলাম, ওঃ। ওঃ। ওঃ ও হো হো হো হো। তারপর গোঙাতে শুরু করলাম। হাতপা ছোঁড়াছুঁড়িও চালিয়ে গেলাম যতটা পারি।

শয়তান ফাদার গ্রিনকটের নেপথ্য অট্টহাসি শোনা গেল হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

আমার হৃৎপিণ্ড রেকাবে রাখলে আমি এলিয়ে পড়লাম। মিনিহুনরা আমাকে চিত করে শুইয়ে দিল। আমার জামা লাল হয়ে গেছে। চবচব করছে একেবারে। মুখ মড়ার মতো করে হাতপা ছড়িয়ে পড়ে রইলাম। মারিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিহুনরা আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে চলল সেই হায়নার ঘরে। গুহার ভেতর যেন প্রাসাদপুরী। কারা বানিয়েছে এই সুন্দর পুরী? মিনিহুনরা তো নয়ই। হয়তো কোনো প্রাচীন যুগের আদিম রাজা এই পাতালপুরী বানিয়েছিল। যেভাবেই হোক ফাদার গ্রিনকট নামে এক শয়তান এখানে আস্তানা করেছে।

হায়েনার ঘর একটা জেলখানা যেন। মনে হল, আদিম পলিনেশীয় রাজার বন্দীশালা ছিল এটা। দুর্গন্ধে বমি আসছে। মাথার ওপর একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোয় চোখের ফাঁক

দিয়ে দেখলাম প্রায় একডজন কুৎসিত চেহারা হায়েনা দাঁত ছরকুটে ঘুমোচ্ছে। কারুর ঠ্যাং ওপরে, কারুর পাশে। মিনিহুনরা একটা ফাঁকা জায়গায় আমাকে ধপাস করে ফেলে চলে গেল। গরাদের দরজা বন্ধ করতে ভুলল না।

একটু পরে সাবধানে কাত হলাম। আমার চারপাশে হায়েনার পাল মড়ার মতো পড়ে আছে। এরা যদি দৈবাৎ জেগে ওঠে, আমাকে বাঁচতে হবে না। হায়েনা মানুষকে ভয় পায়, জানি। কিন্তু এরা এখন দল বেঁধে আছে এবং নরমাংস খেতে অভ্যস্ত হয়েছে নিশ্চয়।

এদিক ওদিক তাকিয়ে উঠে বসলাম। হঠাৎ একটা হায়েনা ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতেই বুক ধড়াস করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফের মড়ার মতো চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর মনে হল, তাহলে কি ওয়েইকাপালি গুহার ভেতর যে হোয়া হোয়া গর্জন শুনেছিলাম তা এইসব হায়েনারই ?

কিন্তু হায়েনা তো মানুষের হাসির মতো শব্দ করে—হাঃ হাঃ হাঃ এইরকম শব্দ। কে জানে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হায়েনারা হয়তো ওই রকম হোয়া হোয়া করে।

কতক্ষণ পরে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর দরজা খুলল। আড়চোখে দেখলাম, কালো কাপড়ে ঢাকা মারিয়ার মূর্তি। তখন উঠে বসলাম।

মারিয়া বললেন, চলে এস আমার সঙ্গে। সাবধান, কোনো শব্দ নয়।...

মারিয়ার কাহিনী

একটা সরু করিডোর দিয়ে মারিয়া আমাকে নিয়ে চললেন। এঘর ওঘর হয়ে একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকলেন। তারপর বিস্ময় ও আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, জ্যোৎস্না।

মারিয়া আমার মুখ চেপে ধরেছেন সঙ্গে সঙ্গে। এ ঘরে সুন্দর একটা বিছানায় জ্যোৎস্না শুয়ে ছিল। উঠে মিষ্টি হেসে চাপাস্বরে বলল, আসুন জয়ন্তদা। মারিয়াঠাকমার আমরা অতিথি।

মারিয়াঠাকমা। বলে কী জ্যোৎস্না। কিন্তু ততক্ষণে মারিয়া কালো আলখেল্লাটা খুলেছেন। এবার দেখি, এ তো এক বৃদ্ধা। তখন মনে হচ্ছিল, যুবতী না হলেও প্রৌঢ়া তো ননই—বড় জোর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি বয়স হবে না। এখনই দেখছি, শণচুলো বুড়ি। মুখের চামড়া কোঁচকানো। কিন্তু গায়ের জোরটা টিকে আছে, তা বোঝাই যাচ্ছে। মারিয়া বললেন, বসো। তবে চেঁচামেচি করা চলবে না। এখন শয়তান গ্রিনকট ওর ল্যাবরেটরিতে আছে। মিনিহুনগুলোর ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছে। গ্রিনকট ওদের মানুষ না বানিয়ে ছাড়বে না।

বললাম, মানুষের কলজে ওদের বুকে ঢুকিয়ে মানুষ বানাবে বুঝি?

মারিয়া বললেন, না, হার্টবদল করবে না। অন্যরকম পদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

তাহলে মানুষের কলজে কী কাজে লাগে ওর?

মারিয়া বললেন, আমি ছত্রিশবছর ধরে ওর পাল্লায় পড়ে বন্দী হয়ে আছি বলতে পারো। কারণ এখান থেকে বেরুনোর পথ খুঁজে পাইনি। তাই বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে জানি না। তবে মাঝে মাঝে টের পেয়েছি, ফাদার গ্রিনকট মিহিহুনের সাহায্যে মানুষ ধরে আনে বাইরে থেকে। কীভাবে ধরে আনে বলছি। মিনিহুনরা জলচরও বটে। খাড়ির সমুদ্রে ডুবে ওত পেতে থাকে। রাতবিরেতে কোনো দুঃসাহসী পর্যটক একলা খাড়ির নিচে চাতালে বেড়াতে এলেই মিনিহুনরা তাকে ধরে আনে। আমার ধারণা, হায়েনার লোকেরা বা সরকারীমহল ভাবেন, পর্যটক বেঘোরে ডুবে মারা পড়েছে। খাড়ির সমুদ্রে প্রচুর হাঙর আছে। কাজেই ওঁরা ধরে নেন, হাঙরে লাশটা খেয়ে ফেলেছে।

জ্যোৎস্না বলল, আমি একবছর আছি হায়েনায়। তার মধ্যে প্রায় ছ সাতজন পর্যটকের রাতে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার কথা শুনেছি।

মারিয়া বললেন, ফাদার গ্রিনকট তাদের হার্ট ওষুধপত্র দিয়ে জিয়েই রাখে। তারপর দেখেছি, কারা এসে সেগুলো কিনে নিয়ে যায়। ওই টাকায় গ্রিনকট তার ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি কিনে আনে।

জ্যোৎস্না বলল, আপনি চুপিচুপি ওর পেছন ধরলে নিশ্চয় বেরুনোর পথ চিনে রাখতে পারতেন। তারপর সেই পথ দিয়ে······

বাধা দিয়ে মারিয়া বললেন, ও ভীষণ ধূর্ত। মিনিহুনরা আমাকে যতই খাতির করুক, ও তাদের ঈশ্বরের মতো। তক্কে তক্কে থাকে। কিন্তু এই যে আমি তোমাদের বাঁচালাম, মিনিহুনরা টের পেলেও গ্রিনকটকে জানাতে পারবে না। কেন জানো ? প্রথম কথা, ওরা মানুষের ভাষা বোঝে না। দ্বিতীয় কথা, ওরা হাবেভাবে মানুষের আচরণ টের পেলেও ওদের ওপর যা হুকুম, তার বাইরে কিছু করবে না। ওদের বোঝানো হয়েছে। আমি বা কোনো বন্দী যেন এই পাতালপুরী থেকে না পালাতে পারে। কিংবা ধরো, দৈবাৎ গুহার মধ্যে মানুষ এসে পড়লে তাকে পাকড়াও করে আনতে হবে। অনেকসময় গুহায় সশস্ত্র লোক ঢুকলে গ্রিনকট টের পায়। যেমন আজ কারা ঢুকে গাঁইতি মেরে সুড়ঙ্গের দেয়াল ভাঙছিল, অমনি গ্রিনকট মিনিহুনদের হুকুম দিলে হায়েনার খাঁচা খুলে দিতে। হায়েনারা গিয়ে তাদের খেয়ে ফেলল।

টিহোর ঘটনাটা আগাগোড়া বললাম। তারপর বললাম সিগারেট কেসের কথা।

শুনে মারিয়া চোখের জল মুছে বললেন, তাহলে এবার শোনো, কীভাবে আমি এখানে ছত্রিশবছর ধরে আটকে রয়েছি।

মারিয়ার কাহিনী সংক্ষেপে হল এই :

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা হঠাৎ মারকিন পার্লবন্দরে হামলা করে। মারিয়া তখন ওখানে ছিলেন হাসপাতালের নার্স হয়ে। বয়স তখন প্রায় তিরিশ বছর। বিয়ে করেন নি। বাবা-মা থাকেন লসএঞ্জেলসে। পার্লবন্দরে যুদ্ধ বাধলে কার্ল অসবোর্ন, পিটার ওলসন, এবং টিহো নামে তিনজন পাইলটকে প্যাসিফিক ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ প্রচুর সোনার বাট আমেরিকার ওয়াশিংটন হেড-অফিসে পৌছে দিতে বলেন। ওরা ছিল বিমানবাহিনীর ভলিন্টিয়ার ফোর্সে। মারিয়ার সঙ্গে ওদের চেনা ছিল। পালিয়ে তখন সবাই প্রাণ বাঁচাচ্ছে। মারিয়া ওদের সঙ্গে ছোট্ট বিমানে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেন।

কাউয়াই দ্বীপের হায়েনাতে পৌছে ওরা হঠাৎ প্লেন নামায় একটা পাহাড়ী উপত্যকায়। ওদের মতলব, সোনাটা হাতাবে। মারিয়া কী করবেন ? ওদের পাল্লায় পড়েছেন তখন। ওদের কথা না মানলে গুলি করে মারবে। আসলে টিহো নামে পলিনেশীয় পাইলটই ওদের এই কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। ওরা রাত্রিবেলা সোনার বাট চারটে প্যাকেট বয়ে নিয়ে এই খাড়ির কাছে পৌছায়। টিহো স্থানীয় লোক বলে এই গুহাগুলোর কথা জানত। ওয়েইকাপালির ভেতর ঢুকে একজায়গায় চারটে প্যাকেট পুঁতে রাখা হয়। তার ওপর দিকে একজায়গায় একটা করচ চিহ্ন খোদাই করে রাখে ওরা।

কিন্তু তারপর সমস্যা দেখা দেয়। ওপর থেকে খাড়াই বেয়ে নামা যতটা সোজা হয়েছিল ওঠা ততটাই কঠিন। মারিয়ার পক্ষে ওঠা তো অসম্ভব। কারণ তাঁর পাহাড়ে চড়ার ট্রেনিং নেই। ওরা তিনজনে উঠে যায় একে একে। কিন্তু মারিয়া অনেক চেষ্টা করেও পারেন নি। যতবার ওঠেন, গড়াতে গড়াতে এসে নিচের চাতালে পড়েন। প্রচণ্ডভাবে আহত হন। তখন ওপর থেকে ওরা আশ্বাস দিয়ে বলে, শিগগির নৌকো নিয়ে আসবে। মারিয়াকে নিয়ে যাবে।

আর আসেনি ওরা। কী হয়েছিল, মারিয়া জানেন না। গুহার ধারে জখম অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর যখন জ্ঞান হয়, দেখেন একটা পাদরীর পোশাকপরা লোক তাঁর শুশ্রূষা করছে। ফাদার গ্রিনকট তার নাম। কিন্তু তখনও টের পাননি মারিয়া, কে এই ফাদার গ্রিনকট।

ছত্রিশবছর ফাদার গ্রিনকটের কাছে বন্দীর মতো জীবন কাটাচ্ছেন মারিয়া। এ ছত্রিশবছরে কয়েকশো মানুষের বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বের করার কাজ তাঁকে দিয়েই করিয়েছে শয়তান গ্রিনকট। কিন্তু সজ্ঞানে নয়—অগ্নিদেবী পিলির পোশাক পরিয়ে সেইরকম সাজিয়ে তাঁকে গ্রিনকট একটা ওষুধ খাইয়ে দেয়। তখন নেশার ঘোরে জ্যান্ত মানুষের বুক চিরে হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলেন হতভাগিনী মারিয়া। বুঝতে পারেন না কী সাংঘাতিক পাপ করছেন।

নেশা চলে গেলে যখন সব টের পান, নির্জনে হুহু করে কাঁদেন। অনুতাপ করেন।

আজ যখন জ্যোৎস্নাকে ধরে আনল মিনিহুনরা, জ্যোৎস্নার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব মায়া হয়েছিল মারিয়ার। চালাকি করে ওষুধমেশানো পানীয়টা নিজের হাতে খাওয়ার ভান করে জামার ভেতর ঢেলে ফেলেছিলেন।

আমাকেও যখন ধরে আনে, তখন ঠিক তাই করেছিলেন। নৈলে জ্যোৎস্না ও আমি 'হৃদয়হীন' মড়া হয়ে হায়েনাদের পেটে চলে যেতাম।......

পালানোর চেষ্টা

মারিয়ার সঙ্গে জ্যোৎস্না ঠাকমা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। কথায় কথায় গ্র্যাণ্ড্মা বলে ডাকছে। ঠাকমার ঘরে আধুনিক যুগের আরামের সবরকম ব্যবস্থা আছে। জ্যোৎস্না দেখলাম ইতিমধ্যে

ঘরের ভেতর কোথায় কী আছে, সব জেনে ফেলেছে। সে কফি বানাল নিজের হাতে। ঠাকমাকেও খাওয়াল। ঘড়িতে তখন বিকেল চারটে বেজেছে। জ্যোৎস্না আগেই দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে নিয়েছে মারিয়ার সঙ্গে। খেয়ে মারিয়া ফাদার গ্রিনকটের আদেশ পালন করতে গিয়েছিলেন—অর্থাৎ কি না আমার হৃৎপিণ্ড ওপড়াতে।

ছু-ছুটো পলিনেশীয় কলা খেয়ে আমার তখনও পেট ফুলে রয়েছে। অমন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, তাতেও কলাছুটো পেটে হজম হয়নি। কী সাংঘাতিক এসব কলা।

আমরা তাড়াহুড়ো করছি না। কারণ মারিয়াঠাকমা বলেছেন, গ্রিনকট কারুর হৃৎপিণ্ড ওপড়ানোর দিন চব্বিশ ঘণ্টা তার যন্ত্র-ঘরে কাটায়। মিনিহুনের পাল তার সঙ্গে থাকে। কাজেই সামনের রাতটা পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় খুঁজে বের করতে হবে বাইরে যাওয়ার পথ।

মাঝে মাঝে দমেও যাচ্ছি। ছত্রিশবছর ধরে মারিয়া যখন বেরুনোর পথ খুঁজে পাননি, তখন মাত্র চৌদ্দঘণ্টা সময় হাতে নিয়ে আমরা কি পথটা খুঁজে পাব?

জ্যোৎস্না বলল, আচ্ছা ঠাকমা। বাইরের লোকেরা হৃৎপিণ্ড কিনতে আসে বললে। তুমি কি লক্ষ্য করোনি কোন পথে তারা যায়?

মারিয়া বললেন, গ্রিনকট তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কিন্তু তখন আমার তাদের ধারে কাছে যাবার উপায় থাকে না। একদল মিনিহুন গ্রিনকটের ঘরের দরজায় পাহারা দেয়। তবে আড়ি পেতে শুনে যা বুঝেছি, মনে হয়েছে যে পূর্বদিকের কোন একটা হ্রদে তারা মোটরবোট রেখে অপেক্ষা করে। তারপর গ্রিনকট সেখানে হাজির হয়। তাদের চোখ বেঁধে ফেলে মিনিহুন-গুলো। ওই অবস্থায় কোন সুড়ঙ্গপথে এই পাতালপুরীতে নিয়ে আসে।

শুনে লাফিয়ে উঠলাম।···ঠাকমা! আমি লেকটা দেখেছি। ওই সুড়ঙ্গপথেই আমি ঢুকেছিলাম পাতালপুরীতে।

মারিয়া বললেন, কিন্তু সেটা খুঁজে বের করতে পারবে কি?

বললাম, অগ্নিদেবী পিলির মূর্তি যেখানে আছে, সেখানে আমাকে বন্দী করেছিল মিনিহুনরা। মূর্তিটা কোথায় আছে আপনি কি জানেন?

মারিয়া বললেন, জানি। কিন্তু মূর্তির ওধারে অজস্র সুড়ঙ্গপথ। আমি সব পথেই বাইরে যাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। বেশির ভাগ সুড়ঙ্গপথই হঠাৎ শেষ হয়েছে। কোনটার শেষে গভীর গর্ত এবং গর্তে জল ফুঁসছে।

আমি স্মরণ করার চেষ্টা করছিলাম, মূর্তিপর্যন্ত আসার সময় কতবার কোনদিকে বাঁক নিয়েছি। বললাম, আর দেরি না করে বরং মূর্তিটার কাছে চলুন। আমার মনে পড়েছে, একটা জায়গায় বাঁদিকে ঘুরেছিলাম। বাকিটা সিধে নাকবরাবর এসেছিলাম। চলুন, চেষ্টা করে দেখি।

জ্যোৎস্না বলল, ঠাকমা। যা নেবার গুছিয়ে একটা পোঁটলা করে নিন।

মারিয়া করুণ হেসে বললেন, নেবার কিছু নেই। আমার জিনিসপত্র এবং পরিচিতিপত্র আর যা ছিল—সবই সেই প্লেনে রেখে এসেছিলাম।

আমি বললাম, একটা আলো-টালো থাকলে বড্ড ভাল হত।

মারিয়া বললেন, পাতালপুরীর যেসব আলো দেখছ, তা ফাদার গ্রিনকটের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে অদ্ভুত কৌশলে প্রতিফলিত করা হয়েছে একটুকরো সামুদ্রিক পাথরে। এ পাথর পাতালপুরীর যেখানে রাখবে অদৃশ্য আলো এসে প্রতিফলিত হবে তার ওপর।

জ্যোৎস্না বলল, লোকটা তাহলে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী।



বললাম, একটুকরো সেই পাথর পেলে ভাল হত তাহলে।

মারিয়া হাসলেন।...পাতালপুরীর বাইরে কিন্তু পাথরের ওপর প্রতিফলন ঘটবে না। কাজেই আমাদের অন্ধকারেই এগুতে হবে।

আমরা আর দেরি করলাম না। বেরিয়ে পড়লাম। মারিয়া ঠাকমা এ-ঘর ও-ঘর করে অনেক করিডোর পেরিয়ে নিয়ে চললেন। একখানে থমকে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন, সাবধান। সামনে যন্ত্রঘর। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। কারণ ওটার দেয়ালের ওপরটা কাচের। আমাদের দেখতে পাবে ওরা।

আগে মারিয়া, তারপর জ্যোৎস্না, শেষে আমি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিলাম। শেষ প্রান্তে গিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড কৌতূহল হল, ভেতরে কী ঘটছে দেখে নিতে।

সাবধানে মুখটা তুললাম। ভেতরে উজ্জ্বল আলো দেখলাম। প্রকাণ্ড হলঘরের একদিকে গোল একটা মঞ্চ। মঞ্চে মিনিহুনেরা ভিড় করে বসে আছে। আর মঞ্চটা আস্তে-আস্তে ঘুরছে। ওদের ওপর একটা প্রচণ্ড লাল আলো এসে পড়ছে। ওদের লাল দেখাচ্ছে। ওরা যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে।

সারা ঘরে আজব সব যন্ত্র, বড় বড় কাচের পাত্র। কোনটাতে বাষ্প উঠছে।

তারপর দেখতে পেলাম ফাদার গ্রিনকটকে।

হলুদ রঙের অদ্ভুত একটা পোশাক পরা লম্বাচওড়া দৈত্যের মতো এক বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে একটা যন্ত্রের সামনে। চাবি টিপছে আর কী সব বলছে। তার মাথায় হলুদ টুপিও আছে। মুখে শাদা গোঁফ-দাড়ি। কিন্তু কী মিঠে অমায়িক মুখের ভাব! হাসি লেগেই আছে।

জ্যোৎস্নার টানে ঝটপট মাথা নামিয়ে সরে গেলাম। কাচের দেয়াল শেষ হলে নীল আলোয় ভরা একটা করিডোর দেখা গেল।

করিডোর পেরিয়ে ডাইনে একটা ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকতেই দেখি সেই ঘর—যেখানে আমাকে মিনিহুনরা ডাব ও কলা খাইয়েছিল।

এখনও সেগুলো পড়ে আছে। বুদ্ধি করে কলার কাঁদিদুটো নিলাম। ইশারায় জ্যোৎস্নাকে ডাবের কাঁদিটা নিতে বললাম। মারিয়াঠাকমা একটু হাসলেন শুধু।

এ ঘর থেকে বেরিয়ে আবার একটা করিডোর। তারপর দরজা খুলতেই দেখি ঘন অন্ধকার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়া ফিস-ফিস করে বললেন, বাইরে থেকে এই দরজাটা খোলা যায় না। কিন্তু ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

আমার পকেটে লাইটার আছে। কিন্তু মারিয়া ঠাকমা লাইটার জ্বালতে নিষেধ করলেন। অন্ধকারে অনেকটা পথ গিয়ে তারপর মারিয়া ফিসফিস করে বললেন, অগ্নিদেবী পিলির মূর্তিটা এখানেই কোথাও আছে।

লাইটার জ্বালালাম। সামনে বেদীর ওপর সেই হিংস্র দেবীমূর্তি। তার চোখ থেকে হিংসা ঠিকরে বেরুচ্ছে যেন। লাইটার নিভিয়ে বললাম, এবার আমি আগে যাব। ঠাকমা, আপনারা আমার পেছনে আসুন।···

টিহোর চেলা তুয়া

প্রায় তিনঘণ্টা অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে ঘোরাঘুরি করছি। কিন্তু বেরুবার পথ পাচ্ছি না। ঘড়িতে সাতটা বাজে। বুঝতে পারছি, বাইরে অন্ধকার রাত। তাই কোন ফাটলে বাইরের আকাশ দেখা গেলেও আমরা চিনতে পারব না—বিশেষ করে আকাশে যদি মেঘ থাকে। তাহলেও কি বারোঘণ্টা আমাদের এখানে কাটানো উচিত হবে? বাইরের পৃথিবীতে আলো ফুটলে কোনো ফাটলে তার

আভাস নিশ্চয় পাব। কিন্তু ততক্ষণে শয়তান গ্রিনকট কি চুপ করে বসে থাকবে ?

মারিয়া বললেন, পথ খুঁজে বের না করতে পারলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। গ্রিনকট খুব নিষ্ঠুর। সে আমাদের ক্ষমা করবে না। তিনজনের হৃৎপিণ্ড নিজেই ওপড়াবে।

জ্যোৎস্না বলল, এবার আমি চেষ্টা করি। তোমরা আমার পেছনে এস।

সে সামনে গেল। তারপর পেছনে মারিয়া, শেষে আমি। কয়েক পা গেছি, হঠাৎ আমার ডানহাতের কলার কাঁদিতে হেঁচকা টান পড়ল। থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু আর কিছু ঘটল না। ভাবলাম অন্ধকারে পাথরে ধাক্কা লেগেছিল।

কিন্তু আবার একটু পরে ফের হ্যাঁচকা টান পড়ল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আরে আরে এ কী !

মারিয়া ও জ্যোৎস্না বলে উঠলেন, কী কী ?

কে কলার কাঁদি ধরে টানল যেন। পরপর দুবার।

জ্যোৎস্না বলল, ভূতে টানছে। অত ভয় যদি, ঠাকমাকে পেছনে যেতে দাও।

রাগ করে বললাম, ভূতটুত আমি মানিনে। চলো, এবার টান পড়লে দেখছি কী ব্যাপার।

আবার কিছুদূরে যাওয়ার পর ফের সেইরকম হ্যাঁচকা টান। সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিদুটো নামিয়ে রেখে লাইটার জ্বাললাম। জ্যোৎস্না ও মারিয়া থমকে দাঁড়িয়েছে। আলো কমে প্রায় শেষ হয়ে আসছে লাইটারের মাথায়। তবু দেখতে ভুল হল না—আমার পেছনে দাঁড়িয়ে একটা মিনিহুন গপ্ গপ্ করে কলা গিলছে।

মারিয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ, তুয়া। তুয়া !

জ্যোৎস্না বলল, তুয়া কি ঠাকমা ?

মারিয়া কান করলেন না জ্যোৎস্নার কথায়। লাইটারের

গ্যাস আর নেই। ঘন অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর মারিয়ার মিঠে গলা শোনা গেল, তুয়া। এ্যাদ্দিন তুই কোথায় ছিলি ?

তারপর টের পেলাম, মারিয়া মিনিহুনটার দিকে এগোচ্ছেন। বললাম, ও ঠাকমা। ব্যাটাচ্ছেলে তুয়া তোমার ন্যাওটা নাকি ?

মারিয়া বললেন, হ্যাঁ। বছর তিনেক আগে তুয়াকে নিয়ে আমি পালানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি ধরা পড়ে যাই। তুয়া পালিয়ে গিয়েছিল। ওর গলায় আমি আমার সরু চেনটা পরিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা এখনও আছে দেখছি। জয়ন্ত, কলার কাঁদি দুটো আমাকে দাও। বাছার বড্ড খিদে পেয়েছে। কতদিন খায়নি মনে হচ্ছে।

কাঁদি দুটো অন্ধকারে ঠাহর করে এগিয়ে দিলাম। তারপর বললাম, ঠাকমা। মনে পড়েছে, টিহোর কাছে যে মিনিহুনটা দেখেছিলাম, তার গলায় এই চেনটাই তাহলে চিকচিক করছিল।

টিহোর কাছে ?

হ্যাঁ, ঠাকমা।

জ্যোৎস্না বলল, তাহলে বোঝা যাচ্ছে, টিহো প্রায়ই এসব গুহায় এসে সোনার প্যাকেট খুঁজে বের করার চেষ্টা করত। কোনোভাবে তুয়াকে সে দেখতে পায়। সঙ্গে নিয়ে যায়।

আমি বললাম, বাকিটা আমিও আঁচ করতে পেরেছি। আজ সকালে ওয়েইকাপালি গুহার ভেতর গ্রিনকটের হায়েনারা যখন টিহো ও তার সঙ্গীদের খেয়ে ফেলে, তখন তুয়া পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত গুহার সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর কারণ কী ওর ?

মারিয়া বললেন, মনে হচ্ছে, দলে ফিরে যাবার জন্যে কানাচে-কানাচে ঘুরছিল। কিন্তু সাহস পায়নি। আহা, বেচারা আজ সারাদিন না খেয়ে আছে। খাও বাছা, সবগুলো খেয়ে ফেলো। তারপর ডাবের জল খাবে। জোস্না ডাবগুলো দাও।

কিছুক্ষণ ধরে তুয়ার খাওয়াদাওয়া হল। তারপর মারিয়া বললেন, আর ভাবনা নেই। তুয়া আমাদের বাইরে পৌঁছে দেবে। বাছাকে এতটুকুন থেকে আমিই লালনপালন করছি বলতে গেলে। ওর বয়স হল নবছর প্রায়। ফাদার গ্রিনকট ওর বাবামাকে নিয়ে উৎকট পরীক্ষা করতে গিয়ে মেরে ফেলেছিল। ওকে আমিই খাইয়ে-দাইয়ে বড় করেছিলাম।

বললাম, তা যাই বলুন ঠাকমা। আপনার এই শ্রীমান তুয়া বড় নেমকহারাম। টিহোর পোষ মেনেছিল কোন আক্কেলে ?

মারিয়া বললেন, প্রাণের দায়ে জয়ন্ত। গ্রিনকটকে মিনিহুনরা বেজায় ভয় করে।

তাই বলে ও আমার ঠ্যাং ধরে টানবে ? রাগ দেখিয়ে বললাম। জানেন ? কোকো পাম হোটেলে ব্যাটাচ্ছেলে আমার টেবিলের তলায় লুকিয়ে ছিল। তারপর ঠ্যাং ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মেরেছিল যে আমি চিৎপাত একেবারে।

মারিয়া বললেন, চুপ। আর কথা নয়। বাছা তুয়া। এবার চলো আমরা বাইরে যাই।

খুড়ো ভাইপোর কীর্তি

শ্রীমান তুয়ার সাহায্যে আমরা প্রাণে বেঁচে ফিরেছি। একটা গোপন পথ আছে কোকো পাম হোটেলের পেছনেই। খাড়ির ধার দিয়ে লম্বা চাতাল চলে গেছে মানিনিহোলা শুকনো গুহার দিকে। টিহো ও পথেই বরাবর গোপনে গুহাগুলোতে গিয়ে সোনা ঢুঁড়ত। বছর তিনেক আগে তুয়াকে সে না খেয়ে কাহিল অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছিল একটা গুহার ভেতর। আমরা ফিরেছি সেই গোপনপথে।

হ্যাঁ, কথাটা টিহোর মুখেই জানতে পারলাম। সেকথা বলছি একটু পরে। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় সে হায়েনার সেণ্ট পল হাসপাতালে রয়েছে এখন। বাঁচবে কিনা বলা কঠিন।

সে রাতে আমরা কোকো পাম হোটেলে পৌঁছে কী তুমুল অভ্যর্থনা পেয়েছি বলার নয়। সারা হায়েনা টাউন আমার ও জ্যোৎস্নার নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়েছিল ববের দৌলতে। কতবার পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন মিলে ওয়েইকাপালির গুহার ভেতর তন্ন তন্ন খুঁজেছে। তারপর পেয়েছে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় টিহোকে। তার সঙ্গীদের তখন ক্ষুধার্ত হায়েনার পাল খেয়ে হজম করে ফেলেছে। টিহো কনটিকির মূর্তির ওপর চড়ে বসেছিল। হায়েনার কামড় খেয়ে তখন তার সারা শরীর রক্তাক্ত।

জনখুড়োর সঙ্গে জুটেছেন আরেক খুড়ো—আংকল ড্রাম ওরফে ঢাকু চাচা। দুজনে মোটরবোটে সহস্র লোকজন নিয়ে ওয়ালিপিলি লেক থেকে সমুদ্র, সমুদ্র থেকে ওয়েইকাপালির খাড়ি পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করেছেন। তারপর হতাশ হয়ে সন্ধ্যায় ফিরে কোকো পাম হোটেলের লাউঞ্জে বসে আছেন। এমন সময় আমরা এসে পৌঁছেছি। তাঁদের চেঁচামেচিতে লোক জড়ো হয়েছে। দেখতে দেখতে কোকোপাম হোটেলের সামনে সে এক জনসমুদ্র। মারকিন দেশ বড় হুজুগে। কত সাংবাদিক, টি. ভির ক্যামেরা কত প্রশ্ন—হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। পরদিন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সব কাগজে তো বটেই, আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে সব বড় বড় কাগজে আমাদের ছবিসহ রোমহর্ষক খবর বেরুল টি. ভিতে সবাই আমাদের দেখল।

মারিয়া ঠাকমাকে পরদিন লসএঞ্জেলস, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশকের লোকেরা টেলিফোনে সাধাসাধি শুরু করল—তাঁর ছত্রিশবছরের গুহাজীবন আর ফাদার গ্রিনকটের কাহিনী নিয়ে তারা বই করতে চায়। লক্ষ লক্ষ ডলারের প্রস্তাব আসছিল। শেষে ঠাকমা হ্যাত্তেরি বলে সবাইকে না করে দিলেন। বই লিখতে হলে

নিজেই সময় মতো লিখবেন। এখন তাঁর মাথায় ঘরে ফেরার চিন্তা।

রাতে কলকাতায় আমার গুরুদেব কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে ট্রাংককল করার চেষ্টা করেছিলাম। লাইন পাইনি। সকালে চেষ্টা করতেই লাইন পেয়ে গেলাম।

গম্ভীর গলায় সাড়া এল। জয়ন্ত নাকি? রাতদুপুরে ঘুম ভাঙালে কেন? আবার মিনিহুন নাকি?

রাতদুপুর কী বলছেন? এখন তো সকাল।

ডার্লিং! তোমার সময়জ্ঞানের গণ্ডগোল আছে বরাবর। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে যে সূর্যকে দেখতে পাচ্ছ, কলকাতায় আসতে তার এখনও প্রায় ঘণ্টা ন'য়েক দেরি আছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাও তো বটে। যাক্ গে, শুনন। ভারি রোমহর্ষক ব্যাপার। আমি···

তার চেয়ে রোমহর্ষক ব্যাপার ঘটেছে আমার ঘরে। অ্যারিজোনার সেই ক্যাকটাসটার ফুলের ভেতর একটা নীল পরাগ থেকে অপূর্ব গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং ইতিমধ্যে পাড়া জুড়ে প্রশ্ন উঠেছে, এ কিসের গন্ধ?

রাগ করে বললাম, আমি মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছি জানেন? গুহার ভেতরে এক শয়তান—তার নাম ফাদার গ্রিনকট, আমার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নিয়েছিল প্রায়। তারপর···

কী নাম বললে?

ফাদার গ্রিনকট।

তাই বলো! জীববিজ্ঞানী ফাদার গ্রিনকট!

অবাক হয়ে বললাম, আপনি চেনেন নাকি?

নাম শুনেছিলাম একসময়। বাঁদরকে মানুষ আর মানুষকে বাঁদরে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই মার্কিন জীববিজ্ঞানীকে জার্মানরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর আর তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

তাহলে শুনুন, এখন তিনি হায়েনার ভুতুড়ে গুহাগুলোর ভেতর একটা পাতালপুরীতে বহাল তবিয়তে বাস করছেন। মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে তার হৃৎপিণ্ড উপড়ে চালান দিচ্ছেন প্রাইভেট ক্লিনিকে।

হুম্। তাহলে ওটাই আদিম পলিনেশীয় রাজা হোলা হুয়ার গোপন প্রাসাদ?

এবার তাহলে বাকিটা শুনুন।

সব শোনা যাবে না ডার্লিং! লাইন কেটে যাবে। তুমি বেঁচে-বর্তে ফিরেছ শুনে খুশি হলাম। আচ্ছা, ছাড়ছি। ঘুম পাচ্ছে।

কর্নেল ফোন রেখে দিলেন। রাগ হল। কিন্তু কী করা যাবে? হাজার হাজার মাইল দূরের লোককে রাগ দেখানোর উপায় আপাতত নেই। আসলে, গোয়েন্দাপ্রবরকে ক্যাকটাস পাঠানোই ভুল হয়েছে। ওই নিয়ে বুঁদ হয়ে আছেন আজকাল। পৃথিবীর সব মানুষ খুন হয়ে গেলেও তাকিয়ে দেখবেন না। বড় বিদঘুটে স্বভাব বুড়োর।

বব এসে বলল, খুড়োকে নিয়ে মহা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি।

কী ঝামেলা?

হায়েনার পুলিশকর্তা গ্যান্সলারকে তাতিয়েছেন। ফের হানা দিতে গেলেন পাতালপুরীতে। সঙ্গে রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ আর কয়েকটা ডিনামাইট। মনে হচ্ছে গোটা এলাকাটা উড়িয়ে দেবে ওরা। ফাদার গ্রিনকটকে আর বাঁচানো যাবে না।

বাঁচিয়ে লাভ কী ব্যাটাচ্ছেলেকে? আমার হৃৎপিণ্ড ওপড়ানোর হুকুম দিয়েছিল মারিয়া ঠাকমাকে।

বব ফিক করে হেসে বলল, ভালই তো। কোনো কোটিপতির বুকে স্থান পেত তোমার হৃৎপিণ্ড। হয়তো তার বুকটা তোমার চেয়ে অনেক চওড়া। তাছাড়া···

বাধা দিয়ে বললাম, নিজের হৃৎপিণ্ডটা দান করে এসো না।

দৈবাৎ মারা পড়লে তাতে আপত্তি করব না। বব আমার হাত ধরে টেনে বলল। যাক্ গে, চলো—ঠাকমাকে নিয়ে টিহোর কাছে যেতে হবে। জোসনাকে ফোনে বলেছি, সেণ্ট পল হাসপাতালে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

হোটেলের ম্যানেজার খাতির করছেন খুব। নিজের গাড়ি করে হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন আমাদের। তুয়া মারিয়াঠাকমার কোলে চড়েছে তো আর তার নামবার নাম করে না। হাসপাতালে তাকে দেখতে ভিড় জমে গেল। কোনরকমে ভিড় ঠেলে আমরা টিহোর কেবিনে ঢুকলাম।

সারা গায়ে ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে টিহো শুয়ে ছিল। তুয়া তার দিকে পিটিপিটি চোখে তাকিয়ে বলল, হূঁ হূঁ হূঁ উঁয়া উঁয়া।

টিহো অতিকষ্টে একটু হাসল। তারপর মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মারিয়া বললেন, কী টিহো! চিনতে পারছ না আমাকে? পাপের শাস্তি পেয়েছ, এতেই আমার আনন্দ হচ্ছে। ওঃ! তোমরা এত বিশ্বাসঘাতক! আমাকে ছত্রিশবছর গুহার ভেতর ফেলে রেখেছিলে! এবার মনে পড়েছে, আমি কে?

মারিয়ার চোখে জল। টিহো আস্তে বলল, চিনেছি। তুমি মারিয়া। আমাকে ক্ষমা করো মারিয়া!

ক্ষমা? মারিয়া ক্ষুব্ধভাবে বললেন। অসবোর্ন আর ওলসন তাদের পাপের শাস্তি পেয়েছে। তুমিও পেয়েছ। তবু তোমাদের ক্ষমা করব না। আমার জীবনটা তোমরা নষ্ট করে দিয়েছ!

টিহো বলল, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তবু বলছি সব। শোনো মারিয়া, আমাদের কোন দোষ ছিল না। কী হয়েছিল, সব বলছি। শোনো।

টিহো যে কাহিনী বলল, তা এই :

মারিয়াকে উদ্ধারের ইচ্ছা তাদের ছিল। প্লেন থেকে হুক আর আর দড়ি আনতে গিয়েছিল তারা। কিন্তু তখন যুদ্ধকালীন জরুরী



অবস্থা চলছে। ওখানে প্লেন দেখতে পেয়ে একদল সৈন্যের টনক নড়ে। প্লেনটা ঘিরে তারা পরীক্ষা করতে থাকে। এমন সময় এরা তিনজনে সেখানে যেতেই তাদের খপ্পরে পড়ে। কোনো কৈফিয়ৎ তারা বিশ্বাস করে না। টিহোদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তারপর পার্লহারবার থেকে খোঁজ নিলে তাঁদের কীর্তি ফাঁস হয়ে যায়। সোনা নিয়ে যাবার কথা কোথায়—আর কোথায় তারা প্লেন নামিয়ে বসে আছে এবং সোনার চিহ্নমাত্র নেই! কোর্ট মার্শালে তিন-জনের একবছর করে জেল হয়। পাছে সোনার হদিস কর্তৃপক্ষ পেয়ে যান, তাই মারিয়ার কথা ওরা বলেনি।

এক বছর পরে টিহো জেল থেকে বেরিয়ে অসবোর্ন ও ওলসনের খোঁজ করে। টিহো ছিল এই হায়েনার জেলে। ওরা দুজন ছিল লসএঞ্জেলসের জেলে। সেখানে গিয়ে টিহো জানতে পারে, অসবোর্ন জেল থেকে পালানোর সময় রক্ষীর গুলিতে মারা পড়েছে। আর ওলসন মারা পড়েছে ক্যান্সারে। জেলকর্তৃপক্ষকে ওলসন মরার আগে বলে গেছে, তার বন্ধু কাউয়াই দ্বীপের রাজবংশধর টিহোকে যেন এই সিগারেটকেসটা পৌঁছে দেওয়া হয়। সিগারেট কেসে লুকানো সোনার সঠিক জায়গা নির্দেশ করা ছিল।

টিহো একা গুহার ভেতর ঢুকতে সাহস পায়নি। পলিনেশীয়দের কুসংস্কার তার মধ্যে ছিল। তাই সে একজন সঙ্গী খুঁজছিল। যুদ্ধের সময় আরেক পাইলটের সঙ্গে তার বন্ধুতা ছিল। তার নাম ফর্স্টার। তাকে সে বিশ্বাস করে সোনার কথা বলে। দুজনে গুহায় ঢুকে সোনার প্যাকেটগুলো আনার পরিকল্পনা করে। কিন্তু লোভী ফর্স্টার রাতারাতি সিগারেটকেসটা চুরি করে কেটে পড়ে। ওতে পলিনেশীয়ার আদিম ভাষায় সঠিক জায়গার হদিস লেখা আছে। ওই হদিস না পেলে টিহোর পক্ষেও সোনা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। টিহোর বোকামি হয়েছিল, যদি একটা কপি রাখত লেখাগুলোর তাহলে সোনাটা খুঁজে বের করতে পারত—আরও

কাউকে সঙ্গে নিত বরং। একা সে কিছুতেই তার পূর্বপুরুষের পাতালপুরীতে ঢুকে অভিশাপের পাল্লায় পড়তে রাজি নয়।

টিহো বুঝতে পারে না, ফর্স্টারের কাছে যে সিগারেটকেস ছিল—তা কেমন করে সুদূর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের মাঠে মাটির তলায় গেল। সে আমার দিকে তাকিয়ে সেই প্রশ্নটা করল।

আমি বললাম, আমার ধারণা—ফর্স্টার ভেবেছিল সুযোগমতো একা গিয়ে সোনা উদ্ধার করবে। সেই সময় তাকে ভারতে পাঠানো হয়। তার প্লেন দৈবাৎ ভেঙে পড়েছিল আমাদের গ্রামের সেই সামরিক বিমানঘাঁটিতে।

টিহো বলল, এতকাল পরে আপনার হাতে একটা সিগারেটকেস দেখলাম—তাতে আমাদের পবিত্র রাজবংশের চিহ্ন! অমনি টের পেলাম, তাহলে এই সেই সিগারেটকেস! কিন্তু ওটা চুরি করে দেখি, ভেতরে অনেক লেখা অস্পষ্ট এবং মুছে গেছে। কাজেই ওটা পেয়েও খুব একটা সুবিধে হল না। তবু ভাবলাম, যেটুকু পড়া যাচ্ছে—তারই সূত্র ধরে খুঁজলে যদি সোনাটা পাই! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য! কোথায় লুকিয়ে ছিল হিংস্র হায়েনার পাল। তারা আমাদের আক্রমণ করল।

অনেকক্ষণ কথা বলে টিহো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ডাক্তার এসে আমাদের বললেন, আর নয়। আপনারা এবার আসুন। এভাবে কথা বললে ওকে বাঁচানো যাবে না।

আমরা বেরিয়ে এলাম। বব বলল, ঠাকমাকে হোটেলে রেখে চলো আমার জনখুড়োর অবস্থা কী হল দেখি।···

ফাদার গ্রিনকর্ট বনাম আংকল ড্রাম

ওয়েইকাপালি গুহার সামনে গিয়ে দেখি যেন যুদ্ধের ঘাঁটি। চারদিকে খাড়ির মাথায় হাজার-হাজার লোক দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা

দেখছে। পাথরে ম্যাপ বিছিয়ে জনখুড়ো, পুলিশকর্তা গ্যান্স্‌লার এবং আরও সব অফিসার তখনও জল্পনা করছেন। আমাদের সেখানে যাওয়ার বাধা ছিল না। কারণ আমরাই তো এই কাণ্ডের মূলে। উঁকি মেরে ম্যাপ দেখে জ্যোৎস্না বলল, দেখছ জয়ন্তদা? ওয়েইকাপালি, ওয়াইকানালে আর মানিনিহোলা - এই তিনটে গুহার মধ্যে কেমন যোগাযোগ রয়েছে। এটা মিলিটারি ম্যাপ মনে হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, যাঁরা গুহার ভেতর সার্ভে করে ম্যাপ এঁকেছেন, তারা রাজা হোলাহুয়ার পাতালপুরীর হদিস পান নি! অথচ দেখে, কনটিকি এবং পিলির মূর্তি কোথায়, তাও ম্যাপে চিহ্ন দিয়ে বলা হয়েছে।

বব হঠাৎ লাফিয়ে উঠল—ইউরেকা!

পুলিশকর্তা গ্যান্স্‌লার হাঁড়িপানা মুখ করে বললেন, কী হে ছোকরা? লাফাচ্ছ কেন?

বব বলল, তুয়া! তুয়াকে আনলেই তো সে পাতালপুরীতে নিয়ে যেতে পারে!

তুয়া? সেটা আবার কী বস্তু? গ্যান্স্‌লার ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন।

জ্যোৎস্না বলল, মিনিহুন। মারিয়াঠাকমার মিনিহুনটার নাম তুয়া। তুয়াই তো আমাদের গাইড।

জনখুড়ো সোজা হয়ে বললেন, মাই গড! এটা আমরা কেউ এতক্ষণ খেয়াল করিনি বব! শিগগির! ম্যাডাম মারিয়াকে গিয়ে বলো, এক্ষুনি ওঁর পোষা প্রাণীটিকে নিয়ে যেন চলে আসেন।

বব বলল, তা যাচ্ছি। কিন্তু খুড়োমশাই, তুয়াকে প্রাণী বলা কি ঠিক হচ্ছে?

জন ধমক দিয়ে বললেন, সব তাতে তক্ক করা চাই! প্রাণী না তো কী? মিনিহুন আসলে অধুনালুপ্ত পলিনেশীয় বাঁদর। তবে তারা বুদ্ধিমান বাঁদর।

জ্যোৎস্না বলল, অধুনালুপ্ত বলছেন কেন খুড়োমশাই ? ফাদার গ্রিনকটের দেখা পেলে দেখবেন অসংখ্য মিনিহুন এখনও বেঁচে আছে পাতালপুরীতে।

বব পুলিশের মোটরবোটে চলে গেল। আমরা ওর ফিরে আসার পথ তাকিয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে এসে গেল খবরশিকারী সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার আর টি.ভি ক্যামেরা নিয়ে একদঙ্গল লোক। মারকিন মুল্লুকে এদের প্রচুর স্বাধীনতা। পুলিশকে গ্রাহ্যও করে না। বরং পুলিশ জানে, এই সুযোগে তাদের নাম যেমন ছড়াবে, তেমনি টিভিতে ঘরে ঘরে তাদের ছবিও লোকে দেখবে।

জনখুড়ো তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, বন্ধুগণ! আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমাদের 'পাতালপুরী অপারেশন' শুরু হয়ে যাবে। এই পাতালপুরীতে আছেন এক ধুরন্ধর জীববিজ্ঞানী—তাঁর নাম ফাদার গ্রিনকট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইনি বানরকে মানুষ এবং মানুষকে বানর করা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। শোনা যায়, হিটলারের হুকুমে তাঁকে জার্মান গুপ্তচরেরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর সব মানুষকে বানর করে ছাড়বেন।

সবাই হেসে উঠল। জনখুড়োর সামনে গোটা পাঁচেক টিভি ক্যামেরার চোখ—এদিকে অনবরত ক্লিক ক্লিক করে শাটার চলেছে কাগজের ফোটোগ্রাফারের। রিপোর্টাররা নোট করে যাচ্ছে কথাগুলো। আমিও কলকাতার প্রখ্যাত দৈনিক সত্যসেবকের রিপোর্টার। কিন্তু এদের আদিখ্যেতা দেখে হাসি পাচ্ছিল।

কতক্ষণ পরে বব ফিরে এল মারিয়া আর তুয়াকে নিয়ে তারপর 'অপারেশন' শুরু হল।

ওয়েইকাপালি গুহার ভেতর উজ্জ্বল আলো ফেলে সামনের সারিতে চলেছেন মারিয়া ও তুয়া, পেছনে সশস্ত্র পুলিশ হাতে সাবমেশিন গান, স্টেনগান, টমিগান, এমন কী কারুর হাতে

গ্রেনেডও। তাদের পেছনে জনখুড়ো, আমি, বব ও জ্যোৎস্না। আমাদের পেছনে টিভির ক্যামেরা।

কনটিকির মূর্তি পেরিয়ে তুয়া বাঁয়ে ঘুরল। বাঁদিকে একটা সরু ফাটল। ফাটলে হাত ভরে সে একটা কিছু টানল। অমনি এবড়োখেবড়ো দেয়ালের খানিকটা অংশ ঘুরে গেল এবং ভেতরে এমনি চওড়া গুহাপথ দেখা গেল।

প্রায় আধঘণ্টা ডাইনেবাইনে ঘুরে একখানে তুয়া ফের তেমনি একটা সরু ফাটলে হাত ভরে কী টানল। এখানেও দরজার মতো ফাঁক হয়ে গেল দেয়াল।

ভেতরে মসৃণ বারান্দার মতো চওড়া খানিকটা জায়গা। তার সামনে কারুকার্যখচিত সুন্দর দরজা। তুয়া দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। তীব্র মিঠে গন্ধ ভেসে এল। পাতালপুরীতে ঢুকলাম আমরা।

কিন্তু এখনও কোথাও আলো জ্বলছে না।

এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে তুয়া যেখানে নিয়ে এল, দেখেই চিনতে পারলাম। সেই যন্ত্রঘর। কাচের দেয়াল। কিন্তু কোথায় ফাদার গ্রিনকট? কোথায় তার মিনিহুনের দল? কোথায় বা সেইসব হিংস্র হায়েনার পাল?

রাজা হোলাহোয়ার পাতালপুরী স্তব্ধ নির্জন। যন্ত্রঘরে যন্ত্রগুলো আছে। কিন্তু বড় বড় কাচের পাত্র থেকে বাষ্প উঠছে না। কোনো আলোও জ্বলছে না। তারপর তুয়ার আর্তনাদ শুনতে পেলাম। তুয়া সেই গোলাকার মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে বোবা মানুষের মতো গলার ভেতর শব্দ করছে—কান্নার মতো শব্দ।

মঞ্চে একটা কালো ছাইয়ের বিরাট স্তূপ দেখা যাচ্ছে। মারিয়া চেঁচিয়ে উঠলেন, সর্বনাশ। শয়তানটা ওদের পারমাণবিক আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

জন বললেন, কাদের? মিনিহুনদের?

মারিয়া কান্নাজড়ানো গলায় বললেন, হ্যাঁ। শয়তান গ্রিনকট ওদের পুড়িয়ে মেরে পালিয়েছে! তুয়া! তুয়া! কোথায় গেল গ্রিনকট, খুঁজে বের করতেই হবে তোকে। প্রতিশোধ নিতে হবে বাছা!

তুয়া অমনি চলতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করলাম আমরা। হায়েনার খাঁচার পাশ দিয়ে যাবার সময় একই দৃশ্য দেখলাম। পলিনেশীয় এক বিচিত্র প্রজাতির হায়েনাদেরও সে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। একি জীববিজ্ঞানীর প্রতিহিংসা?

এবার অগ্নিদেবী পিলির মূর্তি সামনে পড়ল। তার ডাইনে সরু একটা গুহাপথ দিয়ে এগিয়ে বাইরের রোদ্দুর দেখা গেল।

সেই হ্রদটা দেখা যাচ্ছিল নিচে। হ্রদে দুটো মোটরবোট দুজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু লোক দেখা যাচ্ছে না।

তুয়া একটা ফাটল বেয়ে নামতে শুরু করল।

পিঁপড়ের সার যেমন করে নামে, তেমনি করে আমরা, পুলিশ-বাহিনী, সাংবাদিকরা, টিভির লোকেরা নেমে গিয়ে মোটামুটি একটা সমতল বিশাল চাতালমতো জায়গায় পৌঁছিলাম।

হঠাৎ জ্যোৎস্না চেঁচিয়ে উঠল, ও কী! বাবার সঙ্গে গ্রিনকট মারামারি করছ যে।

চাতালের আন্দাজ কুড়ি ফুট নীচে হ্রদের ধারে খানিকটা জায়গায় বালির বিচ। তার ওপর দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে লড়ে যাচ্ছেন আংকল ড্রাম এবং ফাদার গ্রিনকট। জ্যোৎস্না লাফ দিতে যাচ্ছিল, তাকে ধরে আটকালাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে তুয়া ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে গ্রিনকটের ওপর।

ঢাকুচাচা ওপর দিকে তাকিয়ে আমাদের দেখে বিরাট হাসি হাসলেন। ঢাকের মতো গমগম করে বললে, হুমুন্দিরে ধরছিলাম। এ বান্দরটা না আইলে অরে ডুবাইয়া ছাড়তাম ঠাণ্ডা পানিতে। হঃ! আমার নাম ঢাকু মিয়া! আমারে চেনে নাই হুমুন্দির পোলা।

হাসবো কী, তুয়া যা করল, দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সে সরু লিকলিকে হাতে গ্রিনকটের গলা টিপে ধরে হ্যাঁচকা টানে ছুড়ে ফেলল হ্রদের জলে। তারপর জলের ভেতর হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেল। একবারের জন্য ফাদার গ্রিনকটের পা দুটো দেখা গেল। তারপর তলিয়ে গেল চিরকালের মতো।

ঢাকুচাচা দেখতে দেখতে বললেন, হাঙরের পাল হুমুন্দিরে লইয়া গেল। যাউক!······

পদ্মার ইলিশ

পলিনেশীয় রাজা হোলাহুয়ার পাতালপুরী এতদিনে আবিষ্কৃত হয়েছে। হায়েনাটাউনে এবার পর্যটকদের ভিড় বেড়ে যাবে। ওদিকে জনখুড়ো দ্বিতীয় দফা অভিযান চালিয়ে সোনাগুলো উদ্ধার করেছেন। সরকারী কোষাগারে সেটা জমা পড়েছে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের দাবি, ওই সোনার দামে দ্বীপগুলোকে স্বর্গ বানাতে হবে। মারিয়া তুয়াকে নিয়ে স্যাক্রামেণ্টোতে তাঁর বাড়ি ফিরে গেছেন।

আমি ও বব চাচার রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম। জ্যোৎস্না বলল, বব! তোমার জন্য ঝাল কম দিয়েছি। কিন্তু আমাদের দেশের নদী পদ্মার ইলিশ। একটু ঝাল না হলে ভাল লাগে না।

বব বলল, আই উইল ট্রাই। তারপর একটু চেখেই 'ও ফাদার গ্রিনকট' বলে আর্তনাদ করল।

চাচা এসে বলল, কী? পোলাডা চিল্লায় ক্যান? হঃ বুঝছি, গ্রিনকট কইল না? তবে শোনেন।

চাচা তাঁর দেশোয়ালি ভাষায় এবং ববের জন্যে তাঁর নিজস্ব ইংরাজীতে অনুবাদ করে যা বললেন, তা হল : সবাই যখন সামনের

দিকে ফাদার গ্রিনকটকে ধরবে বলে তোড়জোড় করছে তখন উনি পেছনের দিকে ওত পেতে বসাই ঠিক মনে করেছিলেন। মোটর বোট থেকে নেমে মানিনিহোলা গুহার খোঁজে ওপরে উঠতে যাচ্ছেন, হঠাৎ ফাদার গ্রিনকট তাঁর সামনে এসে পড়েছেন। হাবভাব দেখে চাচা তক্ষুনি টের পেয়েছেন, এই সেই হুমুন্দি। অমনি জাপটে ধরেছেন তাকে।

বব ঝোল মুছে ইলিশ চুষতে চুষতে বলল, ফাইন ফিশ। বাট নট বেটার দ্যান সার্ডিন।

চাচা বললেন, বান্দরটা গ্রিনকটেরে না ধরলে আমি ধরতাম। আর করতাম কী জানেন? আষ্টমন লঙ্কা বাঁইটা হেই ঝোলে চুবাইতাম। হঃ।